

ইকামাতে দ্বীন

লিখেছেন অধ্যাপক গোলাম আযম



দ্বীনে বাতিলকে উৎখাত করে দ্বীনে হককে কায়েম করার দাওয়াত ও কর্মসূচী নিয়ে যদি এর দশ ভাগের এক ভাগ লোকও একত্র হয় তাহলে এ দেশের সরকার ও কায়েমী স্বার্থ অস্তির হয়ে যেতো। ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী মহল পত্র পত্রিকায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হৈ চৈ শুরু করতে। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় একটি ইসলামী ছাত্র সংগঠনের মাত্র ১৫/২০ হাজার কর্মীর সম্মেলন ও মিছিল সমস্ত ইসলাম বিরোধী মহলে অদ্ভুত কম্পন সৃষ্টি করেছে। অথচ এ সংগঠনটি কোন রাজনৈতিক দল নয়। তারা ইকামাতে দ্বীনের কথা বলে এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে বলেই কায়েমী স্বার্থ এত বিচলিত।

সকল বাতিল শক্তি ও ইসলাম বিরোধী মহল ভাল করেই জানে যে, তাবলিগ নিছক ও নির্ভেজাল একটি ধর্মীয় জামায়েত এবং রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সরকার নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। সুতারাং তাদের সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার কোন কারণ নেই ও ঘাবড়াবার কোন হেতু নেই।

ঠিক একই কারণে পীর সাহেবানদের ওরস ও মাহফিলের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের সমাবেশকে বাতিল শক্তি ভয় পায় না। এসব মাহফিলে ওয়াজ, তালকিন ও যিকর- এর মারফতে ইসলামের খেদমত নিশ্চই হচ্ছে। কিন্তু সেখানে ইকামাতে দ্বীনের কোন কর্মসূচী না থাকায় ইসলাম বিরোধী মহল চিন্তিত নয়।

এ কথা পরিষ্কার করার জন্যই উদাহরনস্বরূপ মাদ্রাসা, তাবলীগ, ও খানকার উল্লেখ করলাম। খেদমতে দ্বীনের সাথে বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হয় না। একমাত্র ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াত ও প্রোগ্রামের সংগেই এ সংঘর্ষ বাধে। সব নবীর জীবনেই একথা সত্য বলে দেখিয়ে গিয়েছে।

কুরআন মাজিদে যত নবী ও রাসূলের কথা আলোচনা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, সমকালীন ক্ষমতাসীন শক্তি ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থ কোন নবীকেই বরদাশত করতে পারেনি। শুধু হযরত আদম (আঃ) ও হযরত সুলায়মান (আঃ) ছাড়া আর সব নবীর সাথেই বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হয়েছে। ইকামাতে দ্বীনের কর্মসূচী নিয়ে কাজ করায় যদি নবীদেরকেই বাতিলের সাথে সংঘর্ষ করতে হয়ে থাকে তাহলে নবীর উম্মতের পক্ষে এ সংঘর্ষ এড়িয়ে এ ইসলামকে কায়েম করা কি করে সম্ভব হতে পারে?

যারা বাতিলের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলাকে হিকমাত মনে করেন তাদের চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহ পাক নবী রাসূলকে ঐ হিকমাতটা কেন শেখালেন না? আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যারা কাজ করতে চান তারা এ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার কথা ভাবতেই পারেন না। তারা দ্বীনের কোন না কোন দিকের খেদমত অবশ্যই করতে পারেন এবং তাদের সেই খেদমত ইকামাতে দ্বীনের সহায়কও হতে পারে। কিন্তু তাদের ঐ কাজটুকু প্রত্যক্ষভাবে ইকামাতে দ্বীনের কাজ হতে পারে না। তাদের ঐটুকু খেদমত দ্বারা দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে না। দ্বীন কায়েমের জন্য আলাদা কর্মসূচী অবশ্যই দরকার।

ওলামায়ে কেরাম সবাই “ইকামাতে দ্বীনে” সক্রিয় নন কেন?

একথা সত্য যে, বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ ওলামায়ে কেরাম আছেন। তারা বিভিন্ন প্রকার দ্বীনি খেদমতে নিযুক্ত রয়েছেন। ইকামাতে দ্বীনের দাবী অনুযায়ী তারা ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হচ্ছেন না কেন- এ প্রশ্ন অবাস্তব নয়। দীর্ঘকাল আলেম সমাজের গভীর সংস্পর্শ থেকে আমি এ প্রশ্নের জবাব তালাশ করেছি। আল্লাহপাকই সঠিক কারণ জানেন। কিন্তু এ প্রশ্ন এত প্রসঙ্গিক যে, এর উত্তর না পেলে মুসলিম জনগনের পক্ষে ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। আমার সামান্য পর্যবেক্ষনের ফলাফল এখানে প্রকাশ করতে চাই।

একঃ আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলো জনগনের চাঁদায় চলে। যেসব মাদ্রাসা সরকারী সাহায্য পায় তাও অতি সামান্য। মাদ্রাসার গরিব শিক্ষকগণকে মাদ্রাসার আর্থিক সমস্যা সমাধানেও সময় ও শ্রম দিতে হয়। যারা মাদ্রাসায় পড়তে আসে তারা প্রায় সবাই গরীবের সন্তান। বিনা খরচে বা সামান্য খরচে স্কুল কলেজে পড়ান সম্ভব নয় বলে গরীবদের জন্য মাদ্রাসাই একমাত্র সম্বল। ছাত্রদের বই-কিতাব মাদ্রাসাই জোগাড় করে। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা মাদ্রাসার পক্ষ থেকেই করতে হয়।

মুসলিম শাসন আমলে শিক্ষার খরচ রাষ্ট্রই বহন করতো। বর্তমানেও সাধারণ শিক্ষার (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের) ব্যয় ভারের প্রধান অংশ সরকারই বহন করে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা এর ব্যতিক্রম। জনগনের চাঁদার ভিত্তিতে মাদ্রাসাগুলো যে বেঁচে আছে সেটাই আল্লার বড় মেহেরবানী। এ অবস্থায় কুরআন হাদীসের যেটুকু হেফাজত মাদ্রাসা দ্বারা হচ্ছে এর শুকরিয়া আদায় করাও অসম্ভব। তাই মাদ্রাসায় শিক্ষার মান এমন উন্নত হওয়া সম্ভব নয় যেমন হওয়া উচিত। ফলে উন্নত মানের আলেম কমই হচ্ছে।

দুইঃ মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বারা দুনিয়ার উন্নতির কোন আশা নেই বলে ধনী লোকেরা তো মাদ্রাসায় ছেলেদেরকে পাঠায়ই না। গরীবদেরও মেধাবী ছেলেদেরকে বেশির ভাগ স্কুলে পাঠায়। ফলে তুলনামূলকভাবে ভালো ছাত্র মাদ্রাসায় কমই আসে। যারা আসে তারাও মাদ্রাসা পাস করে বা শেষ না করেই দুনিয়ার চাপে কলেজমুখি হয়ে পড়ে।

তিনঃ বর্তমান পরিবেশে যারাই মাদ্রাসায় পড়ে তারা ইসলামের মহাব্বতেই পড়ে। দুনিয়ায় তারা যে বড় কিছু করার সুযোগ পাবে না সে কথা তারা জানে। মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক, বড়জোর স্কুলের আরবী ও দ্বীনীয়াত শিক্ষক, কি নিকাহ-র কাযী ইত্যাদি সুযোগ ছাড়া বড় কিছু করা তাদের ভাগ্যে জুটবেনা বলে তারা ধরেই নেয়।

এ মানসিক অবস্থা নিয়ে যারা মাদ্রাসায় পড়তে বাধ্য হয় তারা শুধু আখেরাতের আশাই করে। মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার মুদাররিস হিসেবে দ্বীনের খেদমত করার সৌভাগ্য তারা যথেষ্ট মনে করতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া মাদ্রাসার পরিবেশ ও জীবনের ভবিষ্যত সম্ভাবনা ছাত্রদের মধ্যে দেশ ও জাতির জন্য বড় কিছু করার সংকল্প সৃষ্টি করে না।

মাদ্রাসা পাস করার পর গরিব আলেমদের রুযী-রোযগার সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়। খুব কম আলেমই এমন আছেন যারা নিজ নিজ দ্বীন পেশার (ইমামতি বা শিক্ষকতা) দায়িত্ব পালন করে ইসলামী আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন এবং সংগঠনের বড় দায়িত্ব নিতে পারেন।

চারঃ আর একটা বড় কারন রয়েছে যার ফলে ইসলামী আন্দোলন অনেক আলেমের নিকট সঠিক গুরুত্ব পাচ্ছে না। মাদ্রাসা শিক্ষায় ইসলামকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে শেখাবার ব্যবস্থা নেই। শুধু ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবেই ইসলামকে শেখান হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানব সমাজকে কিভাবে পরিবর্তন করলেন, কুরআন কিভাবে ২৩ বছর রাসূল (সাঃ)-এর আন্দোলনকে পরিচালিত করেছে, সেই কুরআন ও রাসূলের জীবন(হাদিস) থেকে বর্তমান যুগের ইসলামকে কয়েম করার জন্য কি করা দরকার, এসব দৃষ্টিভঙ্গীতে মাদ্রাসায় এখন পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা চালু হয়নি। ফলে তারা ইসলামকে একটা ধর্ম হিসাবেই জানতে পারছে মাত্র। মাদ্রা শিক্ষার মারফতে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে না। ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ববোধও সে কারণে সৃষ্টি হচ্ছে না।

মাদ্রাসার উস্তাদগন ইসলামের যে পরিমান শিক্ষা দিচ্ছেন তার চেয়ে বেশি ছাত্ররা কি করে শিখবে? কিন্তু মাদ্রাসার যে মেধাবী ছাত্ররা দেশের ইসলামী আন্দোলনকে বুঝতে পারছে তা মাদ্রাসার বাইরের শিক্ষা। অবশ্য মাদ্রাসার ছাত্ররা যেহেতু আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি পেলে তারা আধুনিক শিক্ষার্থীদের তুলনায় অনেক দ্রুত আন্দোলনমুখী হয়ে পড়ে। ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে মাদ্রাসায় যদি শিক্ষা দেয়া হতো তাহলে আলেম সমাজ জাতীয় ব্যাপারে সর্বস্তরে ইসলামী নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতেন।

পাঁচঃ সম্ভবত সবচেয়ে বড় কারন রাসূল (সাঃ)-কে স্রেষ্ঠতম আদর্শ মানা সম্পর্কে সঠিক ধরনার অভাব। ইকামাতে দ্বীনকে তো প্রকৃতপক্ষে আলেম সমাজের জীবনের আসল কর্মসূচী মনে করা উচিত। কিন্তু কেন এটা হয় নি? আমার ধারণায় এর মূল কারন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে উসওয়্যাতুন হাসনা হিসাবে মানার অভাব। এ অভাবেরও কারন আছে। মুসলিম সমাজে একটা বড় রোগ দেখা দিয়েছে। যাকে কোন দিক দিয়ে দ্বীনের বড় খেদমত হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয় তাকেই প্রায় উসওয়্যাতুন হাসানা বা স্রেষ্ঠ আদর্শের মর্যাদা দেয়া হয়। বুয়ুর্গ বলে মানলেই যেন তিনি রাসূলের স্থলাভিষিক্ত বা অন্তত কাছাকাছি বলে মনে করা হয়। তাই ইসলামের আদর্শ হিসেবে কোন আলেম বা পীরকে শ্রদ্ধা করতে গেলেই তাকে রাসূলের স্থলাভিষিক্ত মনে করতে শুরু করে।

একটি উদাহরণ দিলেই কথাটা সহজ ভাবে বুঝা যাবে। উপমহাদেশের একটি কঠিন সময় হযরত মাওলানা কাশেম (রা) দেওবন্দে ইসলামী শিক্ষার আন্দোলন করেন, তখনকার তাঁর এই খেদমত নিশ্চই খুব মূল্যবন। তার প্রতি গোটা মুসলিম জাতি কৃতজ্ঞ। তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করাও স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে, তিনি যে খেদমত করেছেন তার চেয়ে বড় দ্বীনি খেদমত আর হতে পারে না। সুতারাং তারই অনুকরণে একটি মাদ্রাসা কায়েম করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য- তাহলে এ ব্যক্তি হযরত নানতুভী (রঃ)- কে উসোয়াতুন হাসানার মর্যাদা দিল বলে বুঝা যায়। আল্লাহ রাসূল কি একটি মাদ্রাসা কায়েমের জন্য দুনিয়ায় এসেছিলেন? তিনি যে আল্লাহ পূর্ণ দ্বীনকে সমাজে বিজয়ী করার কাজ করে গেলেন সে কাজটাকে কেন জীবনের উদ্দেশ্য মনে করা হয় না? যদি রাসূল (সঃ)- কে জীবনের সব ব্যাপারে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মনে করা হতো তাহলে দ্বীনের আর সব খেদমতের খেদমতকে রাসূলের ব্যাপক খেদমতের একটা অংশ মাত্র মনে করা হতো।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবায়ে কেলাম (রাঃ)- কে নিয়ে দ্বীনের জন্য যা কিছু করে গেছেন তার সবটুকু আমাদের অবশ্য করণীয় কর্তব্য বলে মনে হয় না কেন? হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রা) যতটুকু করেছেন সেটা রাসূলের কাজের সবটুকু নয়। তাকে যদি আদর্শের মাপকাঠি মনে করা হয় তাহলে রাসূল আর মাপকাঠি থাকল কি করে? আদর্শের যে মান রাসূল (সঃ) দেখিয়ে গেছেন সেটাই একমাত্র ষ্ট্যান্ডার্ড বা মান। যে সে মানের যতটুকুতে পৌঁছতে পারে তাকে সে মানেই শ্রদ্ধা করতে হবে। কিন্তু রাসূলের মানে যে কেউ পৌঁছতে পারে না আর কউকে সে রাসূলের সমান মানে শ্রদ্ধার আসন দেয়া যাবে না সে কথা সবার মনে পরিষ্কার থাকতে হবে।

দ্বীনে বাতিলকে উৎখাত করে দ্বীনে হককে কায়েম করার দাওয়াত ও কর্মসূচী নিয়ে যদি এর দশ ভাগের এক ভাগ লোকও একত্র হয় তাহলে এ দেশের সরকার ও কায়েমী স্বার্থ অস্তির হয়ে যেতো। ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী মহল পত্র পত্রিকায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হৈ চৈ শুরু করতো।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় একটি ইসলামী ছাত্র সংগঠনের মাত্র ১৫/২০ হাজার কর্মীর সম্মেলন ও মিছিল সমস্ত ইসলাম বিরোধী মহলে অদ্ভুত কম্পন সৃষ্টি করেছে। অথচ এ সংগঠনটি কোন রাজনৈতিক দল নয়। তারা ইকামাতে দ্বীনের কথা বলে এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে বলেই কায়েমী স্বার্থ এত বিচলিত।

সকল বাতিল শক্তি ও ইসলাম বিরোধী মহল ভাল করেই জানে যে, তাবলিগ নিছক ও নির্ভেজাল একটি ধর্মীয় জামায়েত এবং রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সরকার নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। সুতারাং তাদের সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার কোন কারণ নেই ও ঘাবড়াবার কোন হেতু নেই।

ঠিক একই কারণে পীর সাহেবানদের ওরস ও মাহফিলের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের সমাবেশকে বাতিল শক্তি ভয় পায় না। এসব মাহফিলে ওয়াজ, তালকিন ও যিকর- এর মারফতে ইসলামের খেদমত নিশ্চই হচ্ছে। কিন্তু সেখানে ইকামাতে দ্বীনের কোন কর্মসূচী না থাকায় ইসলাম বিরোধী মহল চিন্তিত নয়।

এ কথা পরিষ্কার করার জন্যই উদাহরণস্বরূপ মাদ্রাসা, তাবলীগ, ও খানকার উল্লেখ করলাম। খেদমতে দ্বীনের সাথে বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হয় না। একমাত্র ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াত ও প্রোগ্রামের সংগেই এ সংঘর্ষ বাধে। সব নবীর জীবনেই একথা সত্য বলে দেখিয়ে গিয়েছে।

কুরআন মাজিদে যত নবী ও রাসূলের কথা আলোচনা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, সমকালীন ক্ষমতাসীন শক্তি ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থ কোন নবীকেই বরদাশত করতে পারেনি। শুধু হযরত আদম (আঃ) ও হযরত সূলায়মান (আঃ) ছাড়া আর সব নবীর সাথেই বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হয়েছে। ইকামাতে দ্বীনের কর্মসূচী নিয়ে কাজ করায় যদি নবীদেরকেই বাতিলের সাথে সংঘর্ষ করতে হয়ে থাকে তাহলে নবীর উম্মতের পক্ষে এ সংঘর্ষ এড়িয়ে এ ইসলামকে কায়েম করা কি করে সম্ভব হতে পারে?

যারা বাতিলের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলাকে হিকমাত মনে করেন তাদের চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহ পাক নবী রাসূলকে ঐ হিকমাতটা কেন শেখালেন না? আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যারা কাজ করতে চান তারা এ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার কথা ভাবতেই পারেন না। তারা দ্বীনের কোন না কোন দিকের খেদমত অবশ্যই করতে পারেন এবং তাদের সেই খেদমত ইকামাতে দ্বীনের সহায়কও হতে পারে। কিন্তু তাদের ঐ কাজটুকু প্রত্যক্ষভাবে ইকামাতে দ্বীনের কাজ হতে পারে না। তাদের ঐটুকু খেদমত দ্বারা দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে না। দ্বীন কায়েমের জন্য আলাদা কর্মসূচী অবশ্যই দরকার।

ওলামায়ে কেলাম সবাই “ইকামাতে দ্বীনে” সক্রিয় নন কেন?

একথা সত্য যে, বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ ওলামায়ে কেলাম আছেন। তারা বিভিন্ন প্রকার দ্বীনি খেদমতে নিযুক্ত রয়েছেন। ইকামাতে দ্বীনের দাবী অনুযায়ী তারা ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হচ্ছেন না কেন- এ প্রশ্ন অবাস্তব নয়। দীর্ঘকাল আলেম সমাজের গভীর সংস্পর্শ থেকে আমি এ প্রশ্নের জবাব তালিশ করেছি। আল্লাহপাকই সঠিক কারণ জানেন। কিন্তু এ প্রশ্ন এত প্রসঙ্গিক যে, এর উত্তর না পেলে মুসলিম জনগনের পক্ষে ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। আমার সামান্য পর্যবেক্ষনের ফলাফল এখানে প্রকাশ করতে চাই।

একঃ আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলো জনগনের চাঁদায় চলে। যেসব মাদ্রাসা সরকারী সাহায্য পায় তাও অতি সামান্য। মাদ্রাসার গরিব শিক্ষকগণকে মাদ্রাসার আর্থিক সমস্যা সমাধানেও সময় ও শ্রম দিতে হয়। যারা মাদ্রাসায় পড়তে আসে তারা প্রায় সবাই গরীবের সন্তান। বিনা খরচে বা সামান্য খরচে স্কুল কলেজে পড়ান সম্ভব নয় বলে গরীবদের জন্য মাদ্রাসাই একমাত্র সম্বল। ছাত্রদের বই-কিতাব মাদ্রাসাই জোগাড় করে। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা মাদ্রাসার পক্ষ থেকেই করতে হয়।

মুসলিম শাসন আমলে শিক্ষার খরচ রাষ্ট্রই বহন করতো। বর্তমানেও সাধারণ শিক্ষার (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের) ব্যয় ভারের প্রধান অংশ সরকারই বহন করে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা এর ব্যতিক্রম। জনগনের চাঁদার ভিত্তিতে মাদ্রাসাগুলো যে বেঁচে আছে সেটাই আল্লাহ বড় মেহেরবানী। এ অবস্থায় কুরআন হাদীসের যেটুকু হেফাজত মাদ্রাসা দ্বারা হচ্ছে এর শুকরিয়া আদায় করাও অসম্ভব। তাই মাদ্রাসায় শিক্ষার মান এমন উন্নত হওয়া সম্ভব নয় যেমন হওয়া উচিত। ফলে উন্নত মানের আলেম কমই হচ্ছে।

দুইঃ মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বারা দুনিয়ার উন্নতির কোন আশা নেই বলে ধনী লোকেরা তো মাদ্রাসায় ছেলেদেরকে পাঠায়ই না। গরীবদেরও মেধাবী ছেলেদেরকে বেশির ভাগ স্কুলে পাঠায়। ফলে তুলনামূলকভাবে ভালো ছাত্র মাদ্রাসায় কমই আসে। যারা আসে তারাও মাদ্রাসা পাস করে বা শেষ না করেই দুনিয়ার চাপে কলেজমুখি হয়ে পড়ে।

তিনঃ বর্তমান পরিবেশে যারাই মাদ্রাসায় পড়ে তারা ইসলামের মহাব্বতেই পড়ে। দুনিয়ায় তারা যে বড় কিছু করার সুযোগ পাবে না সে কথা তারা জানে। মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক, বড়জোর স্কুলের আরবী ও দ্বীনীয় শিক্ষক, কি নিকাহ-র কাযী ইত্যাদি সুযোগ ছাড়া বড় কিছু করা তাদের ভাগ্যে জুটবেনা বলে তারা ধরেই নেয়।

এ মানসিক অবস্থা নিয়ে যারা মাদ্রাসায় পড়তে বাধ্য হয় তারা শুধু আখেরাতের আশাই করে। মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার মুদাররিস হিসেবে দ্বীনের খেদমত করার সৌভাগ্য তারা যথেষ্ট মনে করতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া মাদ্রাসার পরিবেশ ও জীবনের ভবিষ্যত সম্ভাবনা ছাত্রদের মধ্যে দেশ ও জাতির জন্য বড় কিছু করার সংকল্প সৃষ্টি করে না।

মাদ্রাসা পাস করার পর গরিব আলেমদের রুখী-রোযগার সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়। খুব কম আলেমই এমন আছেন যারা নিজ নিজ দ্বীন পেশার (ইমামতি বা শিক্ষকতা) দায়িত্ব পালন করে ইসলামী আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন এবং সংগঠনের বড় দায়িত্ব নিতে পারেন।

চারঃ আর একটা বড় কারণ রয়েছে যার ফলে ইসলামী আন্দোলন অনেক আলেমের নিকট সঠিক গুরুত্ব পাচ্ছে না। মাদ্রাসা শিক্ষায় ইসলামকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে শেখাবার ব্যবস্থা নেই। শুধু ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবেই ইসলামকে শেখান হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানব সমাজকে কিভাবে পরিবর্তন করলেন, কুরআন কিভাবে ২৩ বছর রাসূল (সাঃ)-এর আন্দোলনকে পরিচালিত করেছে, সেই কুরআন ও রাসূলের জীবন(হাদিস) থেকে বর্তমান যুগের ইসলামকে কয়েম করার জন্য কি করা দরকার, এসব দৃষ্টিভঙ্গীতে মাদ্রাসায় এখন পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা চালু হয়নি। ফলে তারা ইসলামকে একটা ধর্ম হিসাবেই জানতে পারছে মাত্র। মাদ্রাসা শিক্ষার মারফতে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে না। ইকামাতে দ্বীনের দ্বায়িত্ববোধও সে কারণে সৃষ্টি হচ্ছে না।

মাদ্রাসার উস্তাদগন ইসলামের যে পরিমাণ শিক্ষা দিচ্ছেন তার চেয়ে বেশি ছাত্ররা কি করে শিখবে? কিন্তু মাদ্রাসার যে মেধাবী ছাত্ররা দেশের ইসলামী আন্দোলনকে বুঝতে পারছে তা মাদ্রাসার বাইরের শিক্ষা। অবশ্য মাদ্রাসার ছাত্ররা যেহেতু আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি পেলে তারা আধুনিক শিক্ষার্থীদের তুলনায় অনেক দ্রুত আন্দোলনমুখী হয়ে পড়ে। ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে মাদ্রাসায় যদি শিক্ষা দেয়া হতো তাহলে আলেম সমাজ জাতীয় ব্যাপারে সর্বস্তরে ইসলামী নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতেন।

পাঁচঃ সম্ভবত সবচেয়ে বড় কারণ রাসূল (সাঃ)-কে স্রেষ্ঠতম আদর্শ মানা সম্পর্কে সঠিক ধরনার অভাব। ইকামাতে দ্বীনকে তো প্রকৃতপক্ষে আলেম সমাজের জীবনের আসল কর্মসূচী মনে করা উচিত। কিন্তু কেন এটা হয় নি? আমার ধারণায় এর মূল কারণ

আল্লাহর রাসূল (সঃ)- কে উসওয়াতুন হাসনা হিসাবে মানার অভাব।এ অভাবেরও কারন আছে। মুসলিম সমাজে একটা বড় রোগ দেখা দিয়েছে। যাকে কোন দিক দিয়ে দ্বীনের বড় খেদমত হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয় তাকেই প্রায় উসওয়াতুন হাসানা বা শ্রেষ্ঠ আদর্শের মর্যাদা দেয়া হয়। বুয়ুর্গ বলে মানলেই যেন তিনি রাসূলের স্থলাভিষিক্ত বা অন্তত কাছাকাছি বলে মনে করা হয়।তাই ইসলামের আদর্শ হিসেবে কোন আলেম বা পীরকে শ্রদ্ধা করতে গেলেই তাকে রাসূলের স্থলাভিষিক্ত মনে করতে শুরু করে।

একটি উদাহরন দিলেই কথাটা সহজ ভাবে বুঝা যাবে। উপমহাদেশের একটি কঠিন সময় হযরত মাওলানা কাশেম (রা) দেওবন্দে ইসলামী শিক্ষার আন্দোলন করেন, তখনকার তাঁর এই খেদমত নিশ্চই খুব মূল্যবন । তার প্রতি গোটা মুসলিম জাতি কৃতজ্ঞ।তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষন করাও স্বাভাবিক।কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে, তিনি যে খেদমত করেছেন তার চেয়ে বড় দ্বীনি খেদমত আর হতে পারে না।সুতারাং তারই অনুকরনে একটি মাদ্রাসা কায়েম করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য- তাহলে এ ব্যক্তি হযরত নানতুভী (রঃ)- কে উসওয়াতুন হাসানার মর্যাদা দিল বলে বুঝা যায়।আল্লাহর রাসূল কি একটি মাদ্রাসা কায়েমের জন্য দুনিয়ায় এসেছিলেন? তিনি যে আল্লাহর পূর্ণ দ্বীনকে সমাজে বিজয়ী করার কাজ করে গেলেন সে কাজটাকে কেন জীবনের উদ্দেশ্য মনে করা হয় না? যদি রাসূল (সঃ)- কে জীবনের সব ব্যপারে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মনে করা হতো তাহলে দ্বীনের আর সব খেদমতের খেদমতকে রাসূলের ব্যাপক খেদমতের একটা অংশ মাত্র মনে করা হতো।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)- কে নিয়ে দ্বীনের জন্য যা কিছু করে গেছেন তার সবটুকু আমাদের অবশ্য করণীয় কর্তব্য বলে মনে হয় না কেন? হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রা) যতটুকু করেছেন সেটা রাসূলের কাজের সবটুকু নয়।তাকে যদি আদর্শের মাপকাঠি মনে করা হয় তাহলে রাসূল আর মাপকাঠি থাকল কি করে? আদর্শের যে মান রাসূল (সঃ) দেখিয়ে গেছেন সেটাই একমাত্র ষ্টান্ডার্ড বা মান।যে সে মানের যতটুকুতে পৌছতে পারে তাকে সে মানেই শ্রদ্ধা করতে হবে।কিন্তু রাসূলের মানে যে কেউ পৌছাতে পারে না আর কউকে সে রাসূলের সমান মানে শ্রদ্ধার আসন দেয়া যাবে না সে কথা সবার মনে পরিষ্কার থাকতে হবে।

দ্বীনের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল

আল্লাহ পাক একমাত্র রাসূল (সঃ)- কে উসওয়াতুন হাসানা বা দ্বীনের মাপকাঠি বানিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের সবচেয়ে বেশী অনুসরন করেছেন বলেই রাসূলের আনুগত্যের ()ব্যপারে তারা শ্রেষ্ঠ আদর্শ।কিন্তু রাসূল যেমন নিজেই আদর্শ সাহাবায়ে কেরাম সে হিসেবে রাসূলের সমান মর্যাদার অধিকারী নন। এমন কি সব সাহাবী এক মানের নন। চার খলিফার সবাইও এক মানের নন।তাই দ্বীনের একমাত্র মাপকাঠি ()রাসূল এবং সবাইকে একমাত্র রাসূলকেই অনুসরন করার চেষ্টা করতে হবে।

আমরা সাহাবায়ে কেরামকে কী জন্য মানি? তাঁদেরকে মানার জন্য নয় বরং - রাসূল (সঃ)- কে মানার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে মানি। রাসূল (সঃ) কে অনুসরন করার ব্যপারে তারাই আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাই রাসূলকে মানার জন্যই তাদেরকে মানতে হবে।কারণ ()বা রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরনের দিক দিয়ে সাহাবায়ে কেরামই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।কিন্তু রাসূল (সঃ)যে অর্থে আদর্শ বা উসওয়া সে অর্থে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা এক হতে পারে না- কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তুলনা করার জন্য একটা সহজ উদাহরন দেয়া যেতে পারে।স্বর্ণকে খাঁটি কি অখাঁটি এবং অখাঁটি হলে কি পরিমান অখাঁটি তা বুঝবার জন্য একপ্রকার পাথর ঘষে জানা যায়।ঐ পাথরকে কষ্টি পাথর বলে।কষ্টি পাথর হলো মানদন্ড বা মাপকাঠি যাকে আরবীতে বলে () কষ্টি পাথর ঘষে যদি স্বর্ণের কোন টুকরাকে একেবারে খাটি সোনা বলেও জানা যায় তবুও ঐ টুকরকে কষ্টি পাথর বলা যাবে না।স্বর্ণ কষ্টি পাথর হতে পারে না।ঠিক তেমনিই আল্লাহর রাসূলই একমাত্র কষ্টি পাথর।সে কষ্টি পাথরে যাচাই করেই সাহাবাগনকে খাঁটি স্বর্ণ বলে জনা যায়, কিন্তু তাই বলে তারা নিজেরা কষ্টি পাথর নন।

সাহাবায়ে কেরামের জামাতকে সামগ্রিক ভাবে খাঁটি হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি হিসেবে সবাই আবার সমান মর্যাদার নন।খোলাফায়ে রাশেদার মর্যাদা আর সব সাহাবা থেকে বেশী।মর্যাদার এ কম বেশের হিসেব কিভাবে করা হয়েছে? একথা সবাইকে স্বিকার করতে হবে , এ হিসাবের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (সঃ)।হযরত উমর (রা)- এর চেয়ে হযরত আবু বকর (রা)- কে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করার মানদন্ড বা মাপকাঠি একমাত্র রাসূল। রাসূলের কষ্টি পাথরে যাচাই করেই এ হিসেব বের করা হয়েছে।

আর একটি তুলনা দ্বারা এ পার্থক্যটা আরও পরিষ্কার হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা)সাহাবী হাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদার মধ্যে গন্য করা হয় না কেন? হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রা)- কে দ্বিতীয় উমর আক্ষা দিয়ে খোলাফায়ে রাশেদার নিকটতম মর্যাদা দেয়া হয় কিভাবে? অথচ তিনি সাহাবী ছিলেন না। কোন মাপকাঠিতে বিচার করে এ দুজনের ব্যপারে এ তারতম্য করা হলো? নিসন্দেহে বলা যায় যে, রাসূলের মাপকাঠিতে বিচার করেই উম্মাত এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

এসব যুক্তি একথা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ রাসূল (সঃ)- একমাত্র আদর্শ মাপকাঠি এবং একমাত্র কষ্টি পাথর। এ কষ্টি পাথরে বিচার করেই মানুষের মধ্যে কে কতটুকু মর্যাদা পেতে পারে তা নির্ণয় করা হয়। যদি রাসূল ছাড়াও আর মানুষকে কষ্টি পাথর মনে করা হয় এবং মাপকাঠি বলে ধারণা করা হয় তাহলে সে ব্যক্তি নিশ্চই রাসূলের চেয়ে নিম্ন মানের হবে। আল্লাপাক রাসূল ছাড়া আর কোন নিম্ন মানের লোককে উসওয়া বা আদর্শ মেনে নিতে বলেননি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, রাসূল (সঃ)- কে আল্লাহপাক যে উসওয়ায়ে হাসানা হিসেবে একক মর্যাদা দিয়েছেন সে মর্যাদা অন্য কারো নীতিগতভাবে স্বিকার না করলেও বাস্তবে দ্বীনি বড় ব্যক্তিত্বকে এমন মর্যাদা দিয়ে ফেলা হয় যা একমাত্র রাসূলেরই প্রাপ্য।

রাসূলকে ওহী দ্বারা পরিচালিত করা হয় বলে তিনি যেমন নির্ভুল, অন্য কোন ব্যক্তি এমন নির্ভুল হতে পারে না। রাসূলকে যেমন অক্ষ ভাবে মেনে নিতে হয় তেমনভাবেও আর কাউকে মানা চলে না। যুক্তি বুঝে আসুক বা না আসুক রাসূলের নির্দেশ মেনে নেয়া যেমন ঈমানের দাবী, আর কার নির্দেশের সে মর্যাদা হতে পারেনা। রাসূল (সঃ) যেমন সমালোচনার উর্ধে আর কেউ তেমন নয়। বিনাযুক্তিতে রাসূলকে মানার জন্য আল্লাহ যেমন নির্দেশ দিয়েছেন অন্য কারও বেলায় তেমন কোন নির্দেশ দেননি।

কোন দ্বীনি ব্যক্তিত্ব যত বিরাট হোক, যদি তাকে নির্ভুল বলে বিশ্বাস করা হয়, তাকে অক্ষ ভাবে মানা হয়, তাঁকে সমালোচনার উর্ধে মনে করা হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে রাসূলের সমান মর্যাদা দেয়া হলো। অথচ মর্যাদার দিক দিয়ে কেউ রাসূলের সমান হতে পারে না।

দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তিই হলো তাওহিদ ও রিসালাত। আল্লাহর যাত ও সিফাতের দিক দিয়ে আর কেউ আল্লাহর সাথে তুলনীয় নয়। তেমনি ওহী দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দরুন রসূল যেমন নির্ভুল তেমন আরকেউ হতে পারে না। এজন্যই রাসূলকে যেমন অক্ষভাবে মানতে হয় তেমন আর কাউকে মানা চলে না। অর্থাৎ উসওয়াতুন হাসানা হিসেবে রাসূল একক। আর কেউ এ পজিশন পেতে পারে না। কালেমা তাইয়েবার মাধ্যমে এই অর্থেই তৌহিদ ও রিসালাতের স্বিকৃতি দিয়ে থাকি।

যদি রাসূলকে একমাত্র আদর্শ মনে করা হতো এবং রাসূলের জীবনকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করাকে ইসলামী জীবনের লক্ষ্য মনে করা হতো তাহলে ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রাম বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ- কে অবশ্যই কর্তব্য মনে করা হতো। ইসলামী আইন চালু করার চেষ্টা বা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন না করলে রাসূলকে যে সত্যিকারভাবে অনুসরণ করা হয় না এ কথা বুঝতে অসুবিধা হতো না।

রাসূল (সঃ) ছাড়া বড় আলেম, পীর বা বুর্জর্গকে আদর্শ মনে করার কারনেই কেউ মাদ্রাসার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করাকেই যথেষ্ট মনে করেন, কেউ ওয়াজ করেই দ্বীনের দায়িত্ব পালন হলো বলে ধারণা করেন, কেউ ইমামতিতেই সমৃষ্ট আছেন। যদি রসূল (সঃ) কে একমাত্র আদর্শ মনে করতেন তাহলে এটুকু খেদমত করার পরও দ্বীন কে বিজয়ী করার জন্য পেরেশান হতেন। তাবলীগ জামাতের দ্বায়ীত্বশীল মুরবিগন যদি রাসূল (সঃ) এর ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনকে আসল আদর্শ মনে করেন তাহলে এ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)- এর রচিত ছয় উসূলের কর্মসূচীকে প্রাথমিক খেদমত বলে ধারণা করবেন। তাহলে তাবলিগের বর্তমান কর্মসূচীকেই হুবহু রাসূলের পরিচালিত আন্দোলন বলে কেউ মনে করবেন না। কিন্তু রাসূল (সঃ) যদি শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে সামনে না থাকে তাহলে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)- কেই আদর্শ মনে করে তার রচিত কর্মসূচীকেই ইসলামের চুরান্ত কর্মসূচী বলে মনে করতে পারে।

“উসওয়াতুন হাসানা” হিসাবে রাসূল (সঃ)- এর মর্যাদাকে সঠিক ভাবে বুঝবার জন্য আর একটা উদাহরণ বিশেষ সহায়ক হতে পারে। কলেজ ইউনিভার্সিটি ও মাদ্রাসার ছাত্রদের পাঠ্যসূচী সম্পর্কে যে সিলেবাস বা নেসাব রচনা করা হয় সেখান থেকেই ফাইনাল পরিক্ষার প্রশ্ন তৈরী করা হয়। যদি ছাত্ররা ঐ সিলেবাস সম্বন্ধে খুব সজাগ না থাকে এবং শিক্ষকেরা সিলেবাস যাতে সবটুকু পড়ান সে দিকে যদি ছাত্ররা লক্ষ না রাখে এবং সিলেবাস যদি সবটুকু পড়া না হয় তাহলে পরীক্ষায় পাস হবার আশা কিছুতেই করা যায় না। ছাত্ররা শিক্ষকের প্রতি যতই শ্রদ্ধা দেখুক, সিলেবাস পড়া বাকি থাকলে পরীক্ষায় ভাল ফল কখনও হবে না। কোন শিক্ষক যদি সিলেবাসের শুধু সহজ অংশটুকু পড়ায় এবং কঠিন অংশ বাদ দেয় তাহলে ছাত্র যতই ভাল হোক পরীক্ষায় ভাল ফল আশা করা যায় না।

আল্লাহ পাক আখেরাতের পরীক্ষায় কামিয়াবীর জন্য রাসূল (সঃ)- এর গোটা জীবনকে সিলেবাস হিসেবে দিয়েছেন। মৃত্যুর পর কবর থেকেই ঐ সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্ন করা হবে। কোন লোককে এ প্রশ্ন করা হবে না যে, হযরত আবু বকর (রঃ) বা ইমাম আবু হনীফা (রঃ) বা হযরত আব্দুল কাদের জিলনী (রঃ)- কে অনুকরণ বা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা।

রাসূলকে সিলেবাসের সাথে তুলনা করলে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সব দ্বীনি ব্যক্তিকে শিক্ষক বা উস্তাদের সাথে তুলনা করা চলে। আমরা সাহাবায়ে কেরাম থেকে রাসূলের জীবন সম্পর্কেই শিক্ষা নেই। রাসূলের সিলেবাস শেখার জন্যই সাহাবাদেরকে শ্রেষ্ঠ উস্তাদ মনে করতে হবে। রাসূলকে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে মেনে চলার প্রয়োজনেই ফেকার ইমামগনকে মানতে হবে। দুনিয়ার সব বিষয় যেমন উস্তাদ থেকেই শিখতে হয়, দ্বীনি জিন্দেগী শিখতে চাইলেও উস্তাদ দরকার। সে উস্তাদকে যে নামেই ডাকা হোক- কাউকে দ্বীনি জামায়াতের আমীর এবং কাউকে শায়েখ বা পীর বলা হোক- প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সবাই উস্তাদ। তাঁদের কাছ থেকে রসূলের গোটা জীবনের সিলেবাস শেখার চেষ্টা করতে হবে। একই উস্তাদের কাছে গোটা সিলেবাস শেখা সম্ভব নাও হতে পারে। যদি আমরা রসূলকে সিলেবাস মনে করি তাহলে সে উস্তাদের কাছে যেটুকু সিলেবাস শেখা যায় সেটুকু শেখার পরও বাকি সিলেবাস শেখার জন্য উস্তাদ তালাশ করতে হবে। কোন এক উস্তাদকেই সিলেবাস মনে করলে, তিনি যেটুকু শেখান সেটুকুকেই যথেষ্ট মনে করলে আখেরাতের ফাইনাল পরীক্ষায় বিপদে পড়তে হবে।

দেশে এত আলেম, পীর ও খাদেমে দ্বীন থাকা সত্ত্বেও ইকামাতে দ্বীনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ার আসল কারন এটাই। রাসূলকে সিলেবাস হিসেবে গ্রহন না করে উস্তাদের অনুসরণ করাই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে। এ মহা ভুল যদি ভাংগে তাহলে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব সবাই বোধ করতে সক্ষম হবেন।

উপমহাদেশের বড় বড় ওলামা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন করেন নি কেন?

মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজেরা এ উপমহাদেশের রাজত্ব কেড়ে নেবার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় আড়াই শ' বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করলে এ প্রশ্নের জবাব সহজে বুঝে আসবে। অনেকেই এ ইতিহাসের গুরুত্ব দেন না। বর্তমানে ওলামা সমাজ যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছেন তারা এ ইতিহাস জানলে নিজেদের করণীয় সম্পর্কে বিবেচনা করতে পারবেন। তাই অতি সংক্ষেপে দীর্ঘ ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু যরুরী ঘটনা বিশ্লেষণ করছি।

পাক- ভারত- বাংলা উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার পর সকল ময়দানে যখন মুসলমানদের উপর যুলুম ও নির্যাতন ব্যাপক হয়ে উঠল তখন নতুন করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার এক মহান আন্দোলন রাজ্যহারা মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করল। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভি (রঃ)- এর বিপ্লবী ইসলামী চিন্তাধারার সূত্র ধরে মাওলানা সাইয়েদ আহমেদ রেলেভী (রঃ) ও মাওলানা শাহ ইসমাইল দেহলভী (রঃ)- এর নেতৃত্বে তাহরিকে মুজাহিদীনের (মুজাহিদ আন্দোলন) মাধ্যমে উত্তর - পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম হয়। সুদূর বাংলা থেকেও বহু মুজাহিদ সে আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন। ১৮৩১ সালে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মাঝামাঝি বালাকোট নামক স্থানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঐ দু'জন মহান মুজাহিদ নেতা শহীদ হন এবং ইংরেজ ও শিখদের সম্মিলিত শক্তির নিকট তাদের মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত হবার ফলে ঐ ইসলামী রাষ্ট্রটি আর টিকে থাকতে পারে নি।

শহীদাইনে বালাকোট নামে প্রশিক্ষ ঐ দু'জন মহান মুজাহিদ নেতা ইসলামী আন্দোলন ও ইকামাতে দ্বীনের এমন গভীর চেতনা মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করে ছিলেন যে, ইংরেজের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত মুসলিমদের মধ্যেও বালাকোটের পরাজয়ের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাদের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে উঠলো এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের রূপ লাভ করলো। এ বিদ্রোহে মুসলমান সিপাহীরাই প্রধান ভূমিকা পালন করার ফলে সম্রাজ্যবাদী ইংরেজ মুসলমানদের উপর খড়গ হয়ে উঠল।

তখন মুসলমানদের চরম দুর্দিন। উপমহাদেশের হিন্দু শিখদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজ রাজত্ব মজবুত হতে থাকল। ইংরেজরা সকল ময়দানে অমুসলিমদেরকে অগ্রসর করে মুসলমানদেরকে দ্বিগুণ গোলামির যিঞ্জিরে আবদ্ধ করল। ইংরেজদের রাজনৈতিক গোলামী ও হিন্দু শিখদের অর্থনৈতিক দাসত্ব মিলে মুসলিম জাতিকে চিরতরে দাবিয়ে রাখার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করল।

পরাজিত, পর্যুদস্ত ও নিষ্পেষিত মুসলিম জাতি যখন দিশেহারা তখন ইংরেজ রাজ্যের অধিনে থেকেই শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা ইত্যাদি ময়দানে হিন্দু ও শিখদের পাশাপাশি মুসলমানদের অগ্রসর করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে স্যার সাইয়েদ আহমাদ আলীগড় শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেন। ইংরেজদের সাথে আপোষের মনোভাব নিয়ে ইংরেজী ভাষা শিখে যাতে মুসলমানরা যাতে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে দরদি মন নিয়ে তিনি এ পথে পা বাড়ান। ইসলামের দৃষ্টিতে এ পরাজিত মনোভাব আপত্তিকর হলেও তিনি পরম আন্তরিকতার সাথেই এ পদক্ষেপ নিলেন। এমন কি এ পরাজিত মনোভাবের ফলে তিনি কুরআনের এমন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলেন যা সত্যিকার ওলামা মহলকে বিচলিত করল। এরই ফলে শুরু হল দেওবন্দ আন্দোলন।

হযরত মওলানা কাসেম নানুতুভী (রঃ)- এর নেতৃত্বে মওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলোভির চিন্তাধারার পথ ধরে কুরআন ও হাদিসের সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের হেফাজতের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে দেওবন্দ দারুল উলুম প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ গোটা উপমহাদেশের অগনিত মাদ্রাসা ঐ আন্দোলনেরই ফসল।

আলীগড় আন্দোলন ইংরেজের সাথে লড়াই- এর পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। আর দেওবন্দ আন্দোলন ইংরেজের গোলামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাবকে টিকিয়ে রাখারই চেষ্টা করে। কিন্তু বলকোটের পরাজয়ের পর এবং সিপাহি বিদ্রোহে ব্যর্থ হবার ফলে মুসলমানদের পক্ষে এককভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাড়াই আর সম্ভব হয় নি।

১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর তুরস্কের মুসলিম খেলাফতকে ইংরেজরা যখন খতম করার ব্যবস্থা করল তখন খেলাফত রক্ষার পক্ষে এক আন্দোলনের উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে আবার জাগরণ দেখা দেয়। খেলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত এ আন্দোলন মুসলমানদের নেতৃত্বে শুরু হয়। এবং এতে দেওবন্দের ভূমিকা আত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিল।

মিঃ গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন এ সুজগে ইংরেজ বিরোধী এ খেলাফত আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করে দেওবন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ হলো। কিন্তু খেলাফত আন্দোলন ও ব্যর্থ হলো। ফলে দেওবন্দের নেতৃত্বে গঠিত জামিয়তে ওলামায়ে হিন্দ নামক নিখিল ভারত ওলামা সংগঠন আরও ইংরেজ বিদ্রোহী হয়ে পড়ল। ইখলাসের সাথেই ওলামায়ে হিন্দ বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজ দেরকে ভারত থেকে না তাড়ান পর্যন্ত মুসলমানদের কোন উন্নতি হতে পারে না এবং ইসলামী খেলাফ কায়মও সম্ভব নয়। তারা একথা বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমানদের একক চেষ্টায় ইংরেজদেরকে তাড়িয়ে দেশ আজাদ করা সম্ভব নয়। তাই ওলামায়ে হিন্দ গান্ধী ও নেহেরুর নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে মিলেই ইংরেজদেরকে বিতারিত করতে করতে চেষ্টা করলেন।

অপর দিকে আলীগড় আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদেরকে স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু বিদ্রোহী করে তুলল। তারা দেখল যে, ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায় সরকারী চাকুরী, ব্যবসায়- বানিজ্য ও সব রকম পেশা দখল করে এমন ভাবে জেঁকে বসেছে যে, শিক্ষিত হয়েও মুসলমানরা কোথাও চাকুরি পাচ্ছে না। ইংরেজরা তো হিন্দুদেরকে একচেটিয়া অধিকার দিয়ে রেখেছিল। এখন সব ময়দানে মুসলমানরা ভাগ বসাতে চায় দেখে হিন্দুরা সব জায়গায় মুসলমানদেরকে কোনঠাসা করে রাখার চেষ্টা করল। চাকুরী , ব্যবসা ও বিভিন্ন পেশায় হিন্দুদের এ আচরন আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদেরকে হিন্দু বিদ্রোহী করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ওলামাদের সাথে এ ব্যাপারে হিন্দুদের কোন সংঘর্ষ ছিল না। হিন্দুদের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলে সর্বত্র যে হিন্দু প্রাধান্য সৃষ্টি হবে সেকথা আধুনিক শিক্ষিত সমাজ যেভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিল ওলামা সমাজের পক্ষে তা বুঝা সম্ভব ছিল না। কারণ মুসলিম সমাজের যে ময়দানে ওলামা কাজ করে ছিলেন সেখানে হিন্দুর সাথে তাদের স্বার্থের সংঘর্ষের কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং হিন্দুদের সাথে কোথাও ওলামাদের প্রতিযোগিতার কারণ ঘটে নি।

কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলেও মুসলমানরা হিন্দুর গোলামই থেকে যাবে বলে শিক্ষিত মুসলিম সমাজ তিব্রভাবে অনুভব করল। পাকিস্তান আন্দোলন এ অনুভূতিরই সৃষ্টি। মিঃ মুহাম্মাদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ দাবি করল মুসলমান সংখ্যা গুরু এলাকায় মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র হতে হবে। এ দাবি ইংরেজ ও হিন্দুর গোলামিতে পিষ্ট মুসলিম সমাজের নব জাগরণের সৃষ্টি করল। মিঃ জিন্নাহ মুসলমানদের নিকট কায়দে আজম (শ্রেষ্ঠ নেতা) হবার মর্যাদা পেলেন।

মুসলমানদের এ পৃথক আন্দোলনে বিচলিত হয়ে কংগ্রেস দাবী করল যে, ভারতে সব ধর্মের লোকই ভারতীয় জাতি হিসেবে এক জাতি। ধর্মের ভিত্তিতে এ মহান জাতিকে বিভক্ত করা কিছুতেই উচিত নয়। কংগ্রেসে এ ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ দাবি করল যে, মুসলমানদের আদর্শ ইসলাম এবং ইসলাম শুধু ধর্ম নয়। তাই ইসলামী জীবন বিধানের ভিত্তিতে মুসলমানরা একটি ভিন্ন জাতি। সে হিসেবে ভারতে দুটো জাতি রয়েছে। ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী মুসলিম জাতি এ আদর্শে বিশ্বাসীদের সাথে মিলে এক জাতি হতে পারে না। এ মতবাদই দ্বিজাতি তত্ত্ব বা “টুনেশান থিউরী” হিসেবে বিখ্যাত।

এ ভাবেই কংগ্রেসের এক জাতি তত্ত্ব ও মুসলিম লিগের দ্বিজাতি তত্ত্ব যখন বিরোধ বাধল তখন ওলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসের পক্ষেই সমর্থন জানাল। ওলামায়ে হিন্দ নেতা হযরত মওলানা হুসাইল আহম্মাদ মাদানী (রঃ) এ বিষয়ে ১৯৩৮ সালে লাহোর শাহী মসজিদে যে বিক্ষোভ বক্তৃতা করেন তাতে তিনি একজাতি তত্ত্ব কে ইসলাম বিরোধী নয় বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। তার এ বক্তৃতাটি মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম (একজাতি তত্ত্ব ও ইসলাম) নামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে এ বক্তৃতার সমস্ত যুক্তি খন্ডন করে কুরআন হাদীস ও ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস থেকে বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে ওলামা মওদুদি (রঃ) প্রমাণ করেন যে, কংগ্রেসের এক জাতি তত্ত্ব ইসলামী জাতীয়তার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর এ বইটি “মাসালায়ে কাওমিয়াত” (জাতীয়তা সমস্যা) নামে প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায় এর অনূদিত বইটির নাম “ইসলাম ও জাতীয়তা বাদ”।

জাতীয়তা নিয়ে এ বিতর্কের ফলে ভারতকে অখন্ড রেখে স্বাধীন করার কংগ্রেসী আন্দোলন ও সুসলমানদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের মুসলিম লীগের আন্দোলন রাজনৈতিক ময়দানে চরম তিক্ততার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে কংগ্রেস সমর্থক ওলামায়ে হিন্দের বিরুদ্ধে মুসলিম শিক্ষিত সমাজ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এর প্রতিক্রিয়া ওলামা সমাজেও দেখা দেয়। দেওবন্দের অধিকাংশ ওলামা কংগ্রেসের সাথে গেলেও মাওলানা সাক্বির আহমাদ ওসমানী (রঃ) ও মাওলানা মুফতী মুহম্মাদ শফী (রঃ)- এর নেতৃত্ব অনেক ওলামা পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে ১৯৪৩ সালে জামিয়তে ওলামায়ে আসলাম নামে ওলামাদের একটি পালটা সংগঠন কায়েম করে মুসলিম লীগের সমর্থন করেন। মাওলানা জাফর আহমাদ ওসমানী (রঃ), মাওলানা সমসুল হক ফরিদপুরী (রঃ), মাওলানা মুফতী দীন মুহাম্মাদ খান (রঃ), শর্ষিনার পীর সাহেব ও ফুরফুরার পীর সাহেব প্রমুখ অনেক ওলামা পাকিস্তান আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন দেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রঃ)- ও মুসলিম লীগের সমর্থন দেন।

এভাবে ওলামা কেলাম বিভক্ত হয়ে এক দল কংগ্রেসের অখন্ড ভারত মতবাদের সমর্থন করেন এবং অন্যদল ভারত বিভাগ করে পাকিস্তান কায়েমের পক্ষ অবলম্বন করেন। এতে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় তার ফলে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ওলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে মুসলিম লীগকে স্বাধীনতার বিরোধী ও ইংরেজের দালাল আক্ষা দেয়া হয়।

ঐ সময় আমি পাকিস্তান আন্দোলনের একজন ছাত্র কর্মী হিসেবে ওলামায়ে হিন্দের সম্পর্কে যে মনোভাবই পোষন করতাম, পরবর্তী কালে সমস্ত ঘটনাকে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিচার করে আমি সিদ্ধান্তে পৌছছি যে, ওলামায়ে হিন্দ মুসলিম লীগ নেতাদের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়া সম্ভব বলে সংগত কারনেই বিশ্বাস করতেন না। তাই দেশ ভাগ করে মুসলিম জাতিকে দু' দেশের মধ্যে বিভক্ত করা তারা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেননি। কিন্তু কংগ্রেসের অখন্ড ভারতের মতবাদ যে মুসলিমদের জন্য মারাত্মক ছিল সে বিষয়ে সংগত কারনেই তাদের ধারণা ছিল না। আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। একথা আমার বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে, মাওলানা মাদানী (রঃ)- এর মতো ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতি হবে বুঝেও দুনিয়ার কোন স্বার্থে কাজ করতে পারেন। এ মানের লোকদের নিয়তের উপর হামলা করার সাহস আমার নেই। ভুল এক কথা, আর বদ- নিয়তে কাজ করা অন্য কথা।

যা হোক উপমহাদেশের ওলামা সমাজ বিভক্ত হয়ে এক দল কংগ্রেস সমর্থক ও অন্য দল মুসলিম লীগ সমর্থকের ভূমিকা যখন সক্রিয়, তখন মাওলানা মওদুদী তাঁর “তারজুমানুল কুরআন” নমক মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে এমন একটি তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করলেন যা ওলামায়ে কেলামের উভয় দলকেই সন্তুষ্ট করল। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মাওলানার বইটি মুসলিম লীগ পছন্দে ওলামায়ে কেলাম মাওলানা মাদানী (রঃ)- এর একজাতি তত্ত্বের মতবাদের বিরুদ্ধে একটি মযবুত হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগান। কিন্তু ১৯৪০ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা মওদুদীর “ইসলামী হুকুমাত কিসতারা হ কায়েম হোতি হয়” (বাংলায় অনুদিত বইটির নাম-- ইমলামী বিপ্লবের পথ) নামক বক্তৃতায় মুসলিম লীগ মহল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। সে বক্তৃতায় তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিমদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন অত্যন্ত সঠিক ও পূর্ণ সমর্থন যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম দেশ কায়েম হলেও কিছুতেই তারা ইসলামী হুকুমাত বা সরকার কায়েম করতে পারবে না। নবী করীম (সঃ)- এর আন্দোলনের বিশ্লেষণ করে তিনি দেখলেন যে, ইসলামকে জানে এবং নিজেদের জীবনে মানে এমন নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী তৈরীর কোন কর্মসূচী না থাকায় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে শুধু অক্ষমই হবে না বরং ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করলে তারা সে আন্দোলনের নেতাকে ফাঁসি দেয়া প্রয়োজন মনে করবে। এ বক্তৃতার ঠিক ১৪ বছর পর সত্যিই তাঁর এ অনুমান সত্য প্রমানিত হয়। ১৯৫৩ সালে মুসলিম লীগ শসনামলে তাঁকে এক অজুহাত দেখিয়ে ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়েছিল।

মাওলানা মাদানী (রঃ)- এর একজাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে মাওলানা মওদুদীর বইটি প্রকাশিত হবার পর দেওবন্দ থেকে ক্রমাগত মাওলানা মওদুদীর বিরুদ্ধে ফতোয়া বের হতে থাকে। কংগ্রেসকে সমর্থন করা মুসলমানদের কিছুতেই উচিত নয় বলে মাওলানা মওদুদী যত জোরালোভাবে লিখতে থাকলেন ততই ফতোয়ার সংখ্যাও বাড়তে থাকলো। এভাবে মাওলানা মওদুদী একদিকে কংগ্রেস সমর্থক ওলামায়ে কেলামের ফতোয়ার শিকারে পরিনত হলেন, অপর দিকে মুসলিম লীগ মহলের নিকটও নিন্দনীয় হলেন। অবশ্য পাকিস্তান কায়েম হবার পূর্ব পর্যন্ত মাওলানা মওদুদীর কতক লেখা পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক ছিল বলে মুসলিম লীগ নেতারা তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নি। কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হবার পর তিনি ১৯৪৮ সালে ইসলামী শসন তন্ত্র রচনার দাবী তুলবার সাথেসাথেই তাকে পাকিস্তান বিরোধী বলে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে জেলে আটক করা হয়।

মাওলানা মওদুদী দ্বিজাতি তত্ত্বের পক্ষে তার বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতম রচনা দ্বারা পাকিস্তান আন্দোলনকে শক্তিশালী করা সত্ত্বেও তিনি মুসলিম লীগে যোগ দান করেন নি। ১৯৪০ সালে আলীগড়ে পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতার পর এক বছর ক্রমাগত তিনি তার মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম লীগ নেতাদের নিকট এমন কতক কর্মসূচীর প্রস্তাব দেন যা না হলে পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বানানো যাবে না। কিন্তু লীগ নেতারা কোন সাড়া না দেয়ায় তিনি ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে লাহোর আগত ৭৫ জন লোক নিয়ে ঐসব কর্মসূচীর ভিত্তিতে “জামায়াতে ইসলামী”র সংগঠন শুরু করেন। ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ঐসব

প্রস্তুতিমূলক কাজ করার ফলেই পাকিস্তান কায়েম হবার পর ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলন মুসলিম লীগ সরকারের তীব্র বিরোধিতা স্বত্বেও এত জোরদার হয়।

বালাকোট ময়দানে ১৮৩১ সালে সইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী (রঃ) ও শাহ ইসমাইল শহীদ (রঃ)- এর শাহাদাতের পর তাদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পতন হয়। এর পর দীর্ঘ একশ বছর মুসলমানদের মধ্যে কি আবস্থা বিরাজ করছিল, এর সংক্ষিপ্ত ধারণা এখানে দেয়ার চেষ্টা করলাম। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কেন একশ বছরের মধ্যেও ইকামাতে দ্বীনের আর একটি আন্দোলন শুরু হতে পারে নি। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন যখন জোরদার হয়ে উঠল এবং মুসলমানরা যখন আবার জেগে উঠে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানাবার মতো শক্তি পেলো তখনই ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন গড়ে তুলবার পরিবেশ সৃষ্টি হলো। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন আবার মুসলমানদের মনে সাড়া জাগালো। এসময় যদি বড় বড় ওলামাগণ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের পেছনে না যেয়ে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারতেন তাহলে হয়তো উপমহাদেশের ইতিহাস ভিন্নরূপ হতো। পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলবার মহান উদ্দেশ্য হয়তো পূর্ণ হতো। উপমহাদেশের মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে ঐ উপযুক্ত সময়ে ওলামায়ে কেরাম “ইকামাতে দ্বীনের” ডাক দিতে পারলেন না।

এ ডাকই দিলেন মাওলানা মওদুদী ১৯৪১ সালে। তখন তার বয়স মাত্র ৩৮ বছর। কিন্তু সে সময় বড় বড় ওলামা প্রায় সবাই কংগ্রেস বা লীগে বিভক্ত। অথচ ঐ দু’ পথের কোনটাই ইসলামী নেতৃত্বে পরিচালিত ছিল না। এ থেকেই মনে হয় যে, তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশ ওলামায়ে হিন্দের নিকট ইংরেজ থেকে আজাদী হাসিলই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আর লীগ পন্থি ওলামাদের নিকট দেশ ভাগ করে স্বাধীন মুসলিম দেশ কায়েমই আসল লক্ষ্য ছিল। এ দুটো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজের নেতৃত্ব দেয়ার মতো পজিশন তাদের ছিল না। তাই তাদের কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের পেছনেই চলতে হয়েছে।

ইতিহাসের ঐ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের আলেম সমাজকে সঠিক শিক্ষা গ্রহন করতে হলে তাদেরকে গভীরভাবে এবং ধীরচিন্তে চিন্তা করতে হবে। ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াত ও কর্মসূচী নিয়ে এ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্দোলন করাই যে দ্বীনের দাবী তা উপলব্ধি করার সময় এসেছে। বিলম্ব করলে বোখারার ন্যয় চির গোলামী, আর না হয় আফগানিস্থানের মতো মুসিবতে পড়বার আশংকা রয়েছে। খোদা না করুন এমন অবস্থা হলে যেটুকু দ্বীনের খেদমতে ওলামাগণ এখন নিযুক্ত আছেন এটুকুর সুযোগ থাকবে কিনা সন্দেহ।

জামাতবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব

ইকামাতে দ্বীনের কাজ কার পক্ষে একা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এমন কি শত যোগ্যতা সত্ত্বেও কোন নবীও একা দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন নি। অবশ্য প্রথমে নবীকে একা শুরু করতে হয়েছে। যে নবীর ডাকে মানুষ সাড়া দেয়নি এবং জামাত বদ্ধ ভাবে কাজ করার সুযোগ যে নবী পাননি তিনি দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন নি।

একটা সমাজ ব্যবস্থাকে বদলিয়ে নতুন করে সে সমাজকে গড়ে তুলবার কাজটি এমন কঠিন ও জটিল যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক এক দল লোকের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া এ বিরাট উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হতে পারে না। তাই প্রত্যেক নবীই মানুষকে আল্লার দাসত্ব কবুলের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে তাঁর আনুগত্য করে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনে তাঁর সাথী হবার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছে।

অর্থঃ “আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর”। প্রত্যেক নবীই এ দাওয়াত দিয়েছেন। কারন একদল লোকের আনুগত্য না পেলে দ্বীনকে বিজয়ী করা সম্ভব নয়।

এ কারনেই ইসলামে জামায়াতের গুরুত্ব এত বেশি। রোজ পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়ে জামায়াতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব গভীরভাবে অনুভব করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি জামায়াতী যিন্দেগিকে ইসলামের আনুগত্যের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন তাকে হাদিসে এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, মেসের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন মেসকে যেমন নেকড়ে বাঘ ধরে নিয়ে যায় তেমনি শয়তান জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে নিজের খপ্পরে নিয়ে নেয়।

এমন কি সফরের সময় দু’জন এক সাথে সফর করলেও একজনকে আমীর মেনে জামায়াতের শৃঙ্খলা মতো চলার জন্য রসূল (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। জামায়াত ছাড়া ইসলামী জিন্দেগী সম্ভব নয় এবং আমীর ছাড়া ও জামায়াত হতে পারে না। এ দ্বারা একথাই প্রমানিত হয় যে, একজন মুসলিম হয় আমীর (হুকুমকর্তা) হবে, না হয় মামুর (হুকুম পালনকারী) হবে। যেমন জামায়াতে নামায আদায় করা অবস্থায় তাকে হয় ইমাম হতে হবে, না হয় মুক্তাদি হতে হবে। কেউ যদি ইমাম বা মুক্তাদি কোনটাই না হয় তাহলে

বুঝতে হবে যে, সে নামাযের জামায়াতে शामिल হয়নি। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন দ্বীনি জামায়াতে शामिल হয়নি সে সঠিক ইসলামী জীবন যাপনের কর্মসূচী গ্রহণই করেনি। এ অবস্থায় সে নাফস ও শয়তানের ধোকা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না।

নবী করীম (সঃ)- এর সময়ে শুধু তারাই মুসলিম বলে গন্য হতেন যারা নবীর জামায়াতে শরীক হয়ে নবীর নিকট বা তাঁর প্রতিনিধির নিকট বাইয়াত হতেন।ঐ জামায়াতের বাইরে থাকলে মুসলিম বলে গন্যই হতো না।ঐ জামায়াতই দ্বীনের একমাত্র জামায়াত বা আল- জামায়াত ছিল।বর্তমানে কোন এক জামায়াতই আল জামায়াতের মর্যাদা পেতে পারে না।রাসূলের আদর্শের ভিত্তিতে যত জামায়াত গঠিত হতে পারে সব জামায়াত মিলে আল- জামায়াত বলে গন্য।কিন্তু যে কোন দ্বীনি জামায়াতে शामिल- ই হয়নি সে ইমানের দিক দিয়ে মোটেই নিরাপদ অবস্থায় নেই।

ইসলামে জামায়াতের এ গুরুত্বকে কোন আলেমই অস্বীকার করতে পারবেন না। আল্লার দ্বীনের খেদমতের জন্য হলেও কোন জামায়াত ভুক্ত হওয়া হাদীসের দৃষ্টিতে কমপক্ষে ওয়াজেব স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই।সুতারাং প্রত্যেক সচেতন মুসলিমকেই কোন না কোন একটি জামায়াতের शामिल হতে হবে।প্রচলিত জামায়াতগুলোর কোনটাই যদি পছন্দ না হয় তাহলে এমন ব্যক্তিকে একটা নতুন জামায়াত গঠন করার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য একটা কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেক দ্বীনি জামায়াত কে ভালভাবে জানার চেষ্টা করা সবারই দায়িত্ব। প্রত্যেক জামায়াতকে কাছে এসেই জানতে হবে এবং সে জামায়াতের দ্বায়িত্বশীল লোকদের কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করতে হবে।উড়ু কথায় কান দিয়ে বা কোন জামায়াতের বিরোধীদের প্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া একেবারেই অযৌক্তিক। যে বিচারক বাদীর অভিযোগ শুনেই আসামীদের জবানবন্দী না নিয়েই রায় দেয় সে বিচারক হবার যোগ্য নয়।তাই কোন জামায়াত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সে জামায়াতকে কাছে থেকে দেখা দরকার।

তাবলীগ জামায়াতের ভাইয়েরা একথা খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে থাকেন।তারা বলেন যে, তাবলীগ জামায়াত কেমন তা যদি সঠিক ভাবে জানতে চান তাহলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য জামায়াতে সময় দিন এবং সাথে থাকুন। তাবলীগের ভাইদের একথা খুবই যুক্তিপূর্ণ।এ যুক্তিটা কিন্তু সব জামায়াতের ব্যপারেই সত্য।তাবলীগী ভাইয়েরাও যদি অন্য জামায়াত সম্পর্কে জানতে চান তাহলে তাদেরকেও একটু সময় দিয়ে সে জামায়াতকে জানতে হবে। শুধু তাবলীগের কাজ করলে অন্য জামায়াতের সাথে তুলনা করার যোগ্যতা কি করে হবে?

আমি যদি তাবলীগ জামায়াতে কাজ করার সুযোগ না পেতাম তাহলে দূর থেকে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করতে পারতাম না। এভাবে আমার তামাদ্দুন মজলিস সম্বন্ধেও জানবার সুযোগ হয়েছে। ইসলাম যে একটা আদর্শিক আন্দোলন এ বিষয়ে এ মজলিসের মাধ্যমেই আমার প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।আমি তিন বছর একই সাথে তাবলীগ জামায়াত ও তামাদ্দুন মজলিসে কাজ করেছি।একটিতে ইসলামের ধর্মীয় দিকের চর্চা করার সুযোগ পেয়েছি এবং অন্যটিতে ইসলামের সামাজিক , রজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকের ইংগিত পেয়েছি।যখন জামায়াতে ইসলামীকে জানবার সুযোগ হলো তখনই ইসলামের সবদিক একই জামায়াতে পেয়ে এখানে যোগদান করেছি।অবশ্য তাবলীগ ও তামাদ্দুনের অবদানকে আমি অন্তর দিয়ে স্বীকার করি। এভাবে তুলনা করার সৌভাগ্য না হলে যে জামায়াতে কাজ করছি সেখানেও তৃপ্তিবোধ করতে সক্ষম হতাম না।

যে কয়টি জামায়াতকে জানবার আমার সুযোগ হয়েছে তার মধ্যে যেটিকে আমি সর্বশেষ গ্রহণ করেছি সেটাই সবার গ্রহণ করা কর্তব্য বলে আমি বলি না।আমার বক্তব্য হলো যে, সব কটা দ্বীনি জামায়াত সম্পর্কে সচেতন মুসলমানদের ভাল ভাবে জানার চেষ্টা করা উচিত।তুলনামূলক ভাবে বিচার করে যে যেটাকে বেশি পছন্দ করবেন সেখানে কাজ করে তিনি বেশী তৃপ্তি পাবেন।আর তুলনা করলে সব জামায়াতেরই দ্বীনি খেদমতটুকুকে স্বীকার করতে সক্ষম হবেন।এক জামায়াতকে বেশি পছন্দ করার অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য জামায়াতকে মন্দ মনে করতে হবে।একটা “বেশী ভাল” বলে স্বীকার করেও অন্যটাকে অন্তত “শুধু ভাল” মনে করা উচিত। একটাকে বেশি পছন্দ করলেই অন্য সবগুলোকে মন্দ মনে করা কোন অবস্থায় জরুরী নয়।

ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে গঠিত জামায়াতের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক সংগঠন, জামায়াত বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে।স্বাভাবিকভাবে ঐ উদ্দেশ্যেই সেখানে লোক তৈরী করার পরিকল্পনা থাকে।যেমন মাদ্রাসা করা করা হয় আলেম তৈরী করার জন্য।যে ধরনের আলেম তৈরীর উদ্দেশ্য থাকে সে জাতীয় সিলেবাসই রচনা করা হয়।যারা কলেজ কায়ম করে তারা মাদ্রাসা থেকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে লোক তৈরী করতে চায় বলে তাদের সিলেবাসও ভিন্ন।খানকার মাধ্যমে আল্লাহ ওয়ালা লোক তৈরীর যে প্রগ্রাম থাকে তা দ্বারা ঐ মানের লোকই তৈরী হয়।তাবলীগ জামায়াতের ছয় উসূলের ভিত্তিতে এবং চিল্লা পদ্ধতিতে ঐ ধরনের লোকই তৈরী হচ্ছে যা এ কর্মসূচী দ্বারা তৈরী হওয়া সম্ভব।এ জামায়াত চেষ্টা করছে যাতে মানুষ দুনিয়ার জিন্দেগীতে মগ্ন হয়ে না থেকে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন গড়ার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে বাড়িঘর ও পেশা থেকে দূরে কিছুদিন তাবলীগের কাজে সময় খরচ করে।মানুষকে আখেরাতমুখী করা নিসন্দেহে দ্বীনি খেদমত।

কিন্তু যে সংগঠন বাতিল সমাজ ব্যবস্থাকে বদলিয়ে আল্লাহর বিধান ও রসূলের আদর্শে সমাজকে গড়তে চায় তার কর্মসূচী এ বিরাট উদ্দেশ্যের উপযোগী হতে হবে। এ জাতীয় জামায়াতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

একঃ এ জামায়াতের দাওয়াত ইসলামের কতক অংশ বা দিকের প্রতি হতে পারে না। ইসলাম যতটা ব্যাপক এ জামায়াতের দাওয়াত ততটা ব্যাপক হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লার দাসত্ব ও রসূলের আনুগত্যের প্রতি এ জামায়াতের দাওয়াত বিস্তৃত হবে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহকে একমাত্র হুকুমকর্তা এবং রাসূল (সঃ) কে একমাত্র আদর্শ নেতা মানার দাওয়াতই এ জামায়াতে দিতে থাকবে।

দুইঃ এ জামায়াত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাকে মানব সমাজের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করবে। গোটা কুরআন পাককে বুঝবার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা চালাবে। ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া, ইহসান এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিকির ও তাহাজ্জুদ থেকে নিয়ে পারিবারিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের অন্যান্য সমস্ত দিক ইসলামের যাবতীয় শিক্ষাকে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

তিনঃ পূর্ণ দীন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য এ জামায়াত স্বাভাবিক কারণেই জনশক্তি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে মানুষকে এ সংগঠনে शामिल করার চেষ্টা করবে। এ জাতীয় সংগঠনে যারাই আসবে তারা জামায়াতের উদ্দেশ্যকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেই আসবে। তারা জনগনকে এ মহান উদ্দেশ্যের সাথে একমত করার চেষ্টা করবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও দাওয়াত দিয়ে মানুষকে জামায়াতে शामिल করতে থাকবে।

চারঃ যারা জামায়াতে যোগদান করে তাদের মধ্যে ইকামাতে দ্বীনের কঠিন দায়িত্ব পালনের উপযোগী প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, চরিত্র ও গুণাবলী সৃষ্টির জন্য এ জামায়াত বিশেষভাবে ব্যবস্থা করবে। যত প্রকার তারবিয়াত বা ট্রেনিং সম্ভব তার মাধ্যমে যোগ্য কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করবে।

পাঁচঃ ইসলামকে বিজয়ী করার ডাক দিয়ে লোক সংগ্রহ করার ফলে এ সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত সরকার ও সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়) সজাগ না হয়ে পারে না। বাতিল নেজাম বা দ্বীনে বাতিল এ জাতীয় জামায়াতকে তাদের জন্য বিপদ জনক মনে করবে।

তাই যত প্রকারে সম্ভব এ জামায়াতের অগ্রগতি রোধ করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে। এ ধরনের জামায়াতের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী দল এক জোট হয়ে প্রচারণা চালাবে যাতে জনগনকে বিভ্রান্ত করা যায়। এ সংগঠনের শক্তি যাতে বৃদ্ধি না পায় সে জন্য দকার হলে বিনা বিচারে মিথ্যা মামলার জালে জড়িয়ে নেতা ও কর্মীদেরকে জেলে পাঠাবে। এভাবে সর্বপ্রকার নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী করার বিরুদ্ধে সকল কায়েমী স্বার্থ উঠে পড়ে পড়ে লেগে যাবে।

ইসলামী জামায়াত হওয়া সত্ত্বেও যদি কায়েমী স্বার্থ কোন সংগঠকে সহ্য করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কিছু না করে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, এ জামায়াত ইসলামের বড় কোন খেদমত করলেও ইকামাতে দ্বীনের কোন কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে না। কায়েমী স্বার্থ বা প্রচলিত সরকার যদি কোন জামায়াতকে তাদের দুশমন মনে না করে তাহলে বুঝতে হবে যে, দ্বীনে হককে কায়েম করার কোন কর্মসূচী সে জামায়াতের নেই।

ছয়ঃ বাতিল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থের এ বিরোধিতা ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হয়। এ বিরোধিতার ফলে এ আন্দোলনের ভীর্ণ কাপুরুষ জাতীয় লোক আসতে সাহস পায় না। দুনিয়ার স্বার্থই যাদের নিকট বড় তারাও এ পথে আসে না। এ পথের জন্য যে জাতীয় নিঃস্বার্থ সাহসী, সংগ্রামী ও জিহাদী মনোভাবের লোক দরকার সে ধরনের লোকই এ সংগঠনে সামীল হয়। একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে যারা ডরায় না তারাই এখানে টিকে থাকে। এ পথাটাই এমন যে, যারাই এ পথে পা বাড়ায় তাহলেই আল্লাহ পাক পরীক্ষা করেন।

অর্থঃ “মানুষ কি মনে করে যে, তার ‘ইমান এনেছি’ বললেই তাদেরকে বিনা পরীক্ষায় ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছে”_ (সূরা আনকাবুতঃ২- ৩)

ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন ছিল বলেই রাসূল (সঃ)- এর সময় সাহাবায়ে কেরামকে এত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আজও যদি সে কাজ কোন জামায়াত করে তাহলে তাদেরকেও পরীক্ষা দিতেই হবে। এ পরীক্ষা ছাড়া কোন লোক যোগার হওয়া সম্ভব নয় যারা ইসলামকে কায়েম করার যোগ্য।

সাতঃ ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের আরও একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এ সংগঠনের কোন ব্যক্তিকে ইখলাস, তাকওয়া এবং আন্দোলনের জন্য কুরবানী ও নিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন মাপকাঠিতে নেতা হিসেবে স্থান দেয়া হয় না। ক্ষমতা দখল যেসব দলের আসল লক্ষ্য অন্য দলের কোন নিতাকে ঐসব দলে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য নেতা হিসেবে গ্রহন করা হয়। ইকামাতে দ্বীনের সংগঠনের কোন লোককে “ রেডী মেড” নেতা হিসেবে গ্রহন করা যায় না। কারণ যে নেতৃত্বের খায়েশ রাখে তাকে নেতা বানান ইসলামী নীতির বিরোধী।

এ কারনেই এ সংগঠনে নেতা হবার কোন প্রতিযোগীতা হতে পারে না। নেতৃত্বের কোন কোন্দলও এখানে হওয়া অসম্ভব। নেতা হবার উদ্দেশ্যে করো পক্ষে এ জাতীয় সংগঠনে ঢুকবার রাস্তাও থাকে না। কিন্তু কোন দলের নেতৃস্থানীয় ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোক যদি নিষ্ঠার সাথে এ সংগঠনে शामिल হয় তাহলে তার আচরন ও কর্মনীতিই তাকে সত্বর নেতৃত্বে পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ এ ধরনের সংগঠনের দায়ীত্বশীলরা যোগ্যতর লোক পেলে তাদের উপর দায়িত্ব দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এ জাতীয় সংগঠনের কেউ নেতা হবার চেষ্টা করে না। এবং নেতার যোগ্যতা সম্পন্ন লোককে নেতৃত্ব গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন ব্যক্তিকে শুধু খ্যাতি, টাকা- পয়সা বা ডিগ্রির ভিত্তিতে নেতা বানান হয় না। আদর্শ ও চরিত্রের মাপকাঠিতেই নেতৃত্ব বাছাই করা হয়।

আটঃ সত্যিকার ইসলামী জামায়াত কোন ব্যক্তি বিশেষকে আন্দোলনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে না। ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে গঠিত জামায়াতের নিকট ইসলামী আদর্শই আসল আকর্ষণ। মানুষকে এ আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করাই এর বৈশিষ্ট্য। নবীর সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু ও ভিত্তি হলো নবীর ব্যক্তিত্ব। নবী ছাড়া সংগঠনের ভিত্তি অন্য কোন ব্যক্তিত্ব হওয়া উচিত নয়। কোন ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে যদি সংগঠন গড়ে তোলা হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর এর অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু আদর্শই যদি সংগঠনের মূল ভিত্তি হয় তাহলে এর প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু সংগঠনের অস্তিত্ব বিপন্ন করে না।

বাংলাদেশে এ জাতীয় জামায়াত আছে কি?

যারা সত্যিই ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব অনুভব করেন তাদের নিকট এ প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল দিক দিয়ে আকর্ষণীয় পূর্ণাঙ্গ জামায়াত পাওয়া যায় না বলে অজুহাত দেখিয়ে ইকামাতে দ্বীনের কাজ না করলে আল্লাহ নিকট ঠেকতে হবে কিনা তা গভীরভাবে বিবেচনা করার বিষয়। মসজিদের ইমাম পছন্দ নয় বলে জামায়াতে শরীক না হয়ে একা নামায পড়া যেমন অন্যায় তেমনি আদর্শ জামায়াত না পেয়ে জামায়াতহীন জীবন যাপন করাও মস্তবড় ভুল।

আপনি যদি ইমাম হবার যোগ্য হন তাহলে নিয়মিত মসজিদে যেয়ে জামায়াত নামাজ আদায় করল মুসল্লিরা অজোগ্য ইমামকে সরিয়ে আপনাকেই ইমাম বানাতে পারে। তখন মসজিদটি যোগ্য ইমাম পেয়ে আরও বেশী আবাদ হবে। তেমনি ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্য যে জামায়াতকে তুলনামূলকভাবে পছন্দ হয় সে জামায়াতে শরীক হয়ে সেটাকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করতে পারেন। আর যদি আপনি নিজে একটা জামায়াত গঠন করার যোগ্যতা রাখেন তা হলে তা-ই করুন। কিন্তু কোন জামায়াত ছাড়া যে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব কার পক্ষে পালন করা কিছুতেই সম্ভব নয় সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

এক সময় এ প্রশ্ন আমার মনেও বিরাট আকারে দেখা দিয়েছিল যে, আমি কোন জামায়াতের সাথে এ কাজ করবো? পূর্বেই বলেছি যে যে দুটো সংগঠনে একই সাথে আমি কাজ করেছিলাম সে দুটো সংগঠনকে আমি এখনও মহব্বত করি। কিন্তু আমার বিবেক যখন আর একটি জামায়াতকে ইকামাতে দ্বীনের ব্যপারে আরও বেশী উপযোগী বলে মনে করলো তখন থেকে সে জামায়াতেই কাজ করছি। এ বিষয়টা সম্পূর্ণ প্রত্যেকের বিবেকের উপর নির্ভর করে। দ্বীনের জ্ঞান, ইকামাতের দায়িত্ববোধ ও ইসলামের ভিত্তিতে প্রত্যেককেই নিজের ব্যপারে নিজেই এ বিষয়ে স্বিদ্বান্ত নিতে হবে। আমি যে স্বিদ্বান্তে পৌঁছেছি সবাই সে স্বিদ্বান্তে আমার সাথে একমত না- ও হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে যে, ইকামাতে দ্বীনের জন্য যে বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন সে মাপকাঠিতে বিচার করেই পছন্দসই জামায়াত বাছাই করতে হবে।

ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বটা এমন মামুলী বিষয় নয় যে, ভালভাবে তুলনা না করে এবং বিচার বিবেচনা না করে হঠাৎ না বুঝেই কোন জামায়াতে ঢুকে পড়া যায়। যে জামায়াতে যাচ্ছি সেখানে ইকামাতে দ্বীনের উপযোগী দাওয়াত ও কর্মসূচী আছে কিনা ইকামাতের যোগ্য লোক তৈরীর ব্যবস্থা কতটুকু সেখানে আছে এবং ইকামাতের জন্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য গুলো কী পরিমাণে আছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বাছাই করতে হবে। আল্লাহপাক আমাকে যতটুকু জ্ঞান- বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন তাতে ইকামাতের উদ্দেশ্যে যামায়াতে ইসলামীর চেয়ে উন্নত কোন জামায়াত আমি পাইনি। এ জামায়াতকে আরও উন্নত করা এবং এর মধ্যে যে যে দিকে কমতি রয়েছে বা ত্রুটি আছে তা দূর করার সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। কারণ আমার বিচারে আদর্শ জামায়াত হচ্ছে একমাত্র সাহাবায়ে কেরামের জামায়াত। ঐ জামায়াতকে মাপকাঠি ধরে যখন বিচার করি তখন জামায়াতে ইসলামীতে অনেক অভাব ও

অনেক ক্রটি পাই। দেশের অন্যান্য জামায়াতের সাথে তুলনা করে জামায়াতে ইসলামীর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গৌরব করার মতো ক্ষুদ্র মন যাতে আমার না হয় সে জন্য আল্লার সাহায্য চাই। এ জামায়াত যদি ইকামাতে দ্বীনের মহান দায়িত্ব পালন করতে চায় তাহলে সাহায্যে কেবলমাত্র জামায়াতকে আদর্শ মনে করে ঐ মানে পৌঁছান চেষ্টা সম্ভব তা-ই করতে হবে। প্রচলিত কোন দলের সাথে তুলনা করে অত্ম তৃপ্তি বোধ করার কোন অবকাশ নেই।

আমি খালেস দ্বীনি জযবা নিয়ে ঘোষণা করছি যে, আল্লার দ্বীনকে এ দেশে কায়েম করার জন্য যদি জামায়াতে ইসলামীর চেয়ে আবও উন্নত কোন সংগঠন আমি পাই এ জামায়াত ছেড়ে ঐ সংগঠনে যোগ দান করা ফরয মনে করবো। কারণ ইকামাতে দ্বীনই আমার লক্ষ্য। সে মহান উদ্দেশ্য যে জামায়াতের মাধ্যমে হাসিল হওয়ার সম্ভাবনা ও আশা বেশী সে জামায়াতে शामिल হওয়াই আমি কর্তব্য বলে বিশ্বাস করি।

জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদুদী (রঃ)

ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা উচিত কিনা তা যোগদানকারীর বিবেচনার বিষয়। এ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আল মওদুদী (রঃ)। তিনি দুনিয়ায় এখন না থাকলেও যেহেতু তার তাঁর সাম্পর্কে নানা কথা প্রচলিত আছে, সেহেতু বর্তমান জামায়াতে ইসলামীর সাথে মরহুমের কি সম্পর্ক সে বিষয়ে কিছু যরুরী কথা পেশ করছিঃ

একঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আল মওদুদী (রঃ) আজীবন একথার উপর জোর দিয়েছেন যে, আল্লার রাসূল (সঃ) ছাড়া আর কোন ব্যক্তিকে অন্ধভাবে মানা উচিত নয়। একমাত্র রাসূলই ওহী দ্বারা পরিচালিত হবার করণে নির্ভূল। অন্য কেউ ভুলের উর্ধে নয়।

সুতারাং মাওলানা আবুল আল মওদুদী (রঃ) কোন কথাকেই রাসূলের কষ্টি পাথরে যাচাই না করে আমি মানতে রাজি নই। কুরআন ও সুন্নার বিচারে তার মাতামত যতটুকু গ্রহণযোগ্য মনে হয় আমি ততটুকু গ্রহণ করি। এটাই জামায়াতে ইসলামীর নীতি।

১৯৪১ সালে যখন তিনি জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন তখন তিনি নিম্নরূপ ঘোষণা দেনঃ

“ পরিশেষে একটি কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই। ‘ফিকাহ’ ও ইলমে কালামের বিষয়ে আমার নিজস্ব একটি তরীকা আছে। আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান গবেষণার ভিত্তিতে আমি এটি নির্ণয় করেছি। গত আট বছর যারা ‘তারজুমানুল কুরআন’ পাঠ করেছেন তারা এ কথা ভালভাবেই জানেন। বর্তমানে এ জামায়াতের আমীর পদে আমাকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। কাজেই এ কথা আমাকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হচ্ছে যে, ফিকাহ ও কালামের বিষয়ে ইতিপূর্বে আমি যা কিছু লিখেছি একং ভবিষ্যতে যা কিছু লিখব অথবা বলবো তা জামায়াতে ইসলামীর আমীরের ফয়সালা হিসেবে গন্য হবে না বরং হবে আমার ব্যক্তিগত মত। এসব বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত রায়কে জামায়াতের অন্যান্য আলেম ও গবেষকদের উপর চাপিয়ে দিতে আমি চাই না এবং আমি এও চাইনা যে, জামায়াতের পাক্ষ থেকে আমার উপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে যার ফলে ইলমের ক্ষেত্রে, আমার গবেষণা করার এবং মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হবে। জামায়াতের সদস্যদেরকে (আরকান) আমি আল্লার দোহাই দিয়ে নির্দেশ দিচ্ছি যে, ফিকাহ ও কালাম শাস্ত্র সম্পর্কিত আমার কথাকে আপানারা কেউ অন্যের সম্মুখে প্রমান স্বরূপ প্রকাশ করবেন না। অনুরূপভাবে আমার ব্যক্তিগত কার্যাবলীকেও---- যেগুলোকে আমি নিজের অনুসন্ধান ও গবেষণার পর জায়েয মনে করেছি---- অন্য কেউ যেন প্রমান স্বরূপ গ্রহণ না করেন এবং নিছক আমি করেছি এবং করেছি বলেই যেন বিনা অনুসন্ধানে তার অনুসারী না হন। এব্যাপারে প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। যারা যারা ইলম রাখেন, তারা নিজেদের গবেষণা অনুসন্ধান মুতাবিক আর যারা ইলম রাখেন না, তারা যারা ইলমের উপর আস্থা রাখেন, তার গবেষণা অনুসন্ধান মুতাবিক কাজ করে যান। উপরোক্ত এ ব্যাপারে আমার বিপরীত মত পোষণ করার এবং নিজেদের মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা প্রত্যেকের রয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই ছোটখাট এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন মতের অধিকারী হয়ে পরস্পরের মুকাবিলায় যুক্তি প্রমান পেশ করে এবং বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েও একই জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারি--- যেমন সাহাবেয়ে কেবরাম রাযিয়ল্লাহ আনহু ছিলেন।

দুইঃ জামায়াতে ইসলামীতে হানাফি মাযাহাব ও আহলে হাদীসের অনুসারী ব্যক্তির সমাবেশ রয়েছে। এ জামায়াতে আহলে সুন্নাহ আল জামায়াতের যে কোন মাযাহাবের লোক शामिल হতে পারে। জামায়াতে ইসলামী একটি জামায়াত হিসেবে কোন এক মাযাহাবের ফেকাহ মানতে বাধ্য করে না। যারা জামায়াতে যোগ দান করে তারা তাদের মাযাহাবের অনুসরণ করে। মাওলানা মওদুদী হানাফি মাযাহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু জামায়াতের মধ্যে আহলে হাদীসের লোকও রয়েছে।

তিনিঃ জামায়াতের সবাই ইসলাম সম্পর্কে অতীত ও বর্তমান সকল লেখকের বই থেকে স্বাধীন ভাবে মতামত গ্রহন করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীর, হাদীস ও ফেকহ ইত্যাদি থেকে জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে আপন মতামত স্থির করার অধিকার রয়েছে। মওলানা মওদুদী (রঃ) চিন্তার স্বাধীনতার উপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই তাকে অন্ধভাবে অনুসরণের কোন আশংকা নেই।

চারঃ জামায়াতে ইসলামী মওলানা মওদুদী (রঃ)- কে ফেকাহ বা আকায়েদের ইমাম মনে করে না। তাঁর ইজতেহাদকে মেনে নেয়াও জামায়াতের কোন নীতি নয়। জামায়াতে ইসলামীর নিকট মওলানা মওদুদী (রঃ) তিনটি কারণে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

(ক) এ যুগে মওলানা মওদুদীর সাহিত্য ইসলামকে একমাত্র পূর্ণংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেশ করে দ্বীন ইসলামের সঠিক মর্যাদা বহাল করেছেন। ইসলাম সুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বলে সমাজে যে ভুল ধারণা ছিল তা তাঁর লেখা বিপুল সংখ্যক বই পুস্তকের মাধ্যমে মানুষ বুঝতে শিখেছে। এ উপমহাদেশে ইসলামের এ ব্যপক ধারণা এমন স্পষ্ট ছিল না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ দাসত্ব ও নবীর আনুগত্য করা যে ইসলামের দাবী একথা উপমহাদেশের মানুষের নিকট তিনিই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ যে গোটা মানব জীবনের জন্য একমাত্র সঠিক ব্যপক হেদায়াত একথা তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

(খ) দ্বীন ইসলামকে বাস্তবে মানব সমাজে কায়ম করা যে মুসলমানের প্রধান দায়িত্ব একথা মওলানা মওদুদী (রঃ) অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পেশ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, এ শতাব্দীতে তিনিই ইকামাতে দ্বীনের ডাক দিয়ে এ উপমহাদেশে পয়লা বাতিলের বিরুদ্ধে জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ইকামাতে দ্বীনের এ ডাকে যারা সাড়া দিয়েছেন এবং দিচ্ছে তারা আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভব করেই যামায়াতবদ্ধ হওয়া ফরয মনে করছে।

তিনি ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য এ জাতীয় আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন বলেই গোটা উপমহাদেশে ইসলাম আজ একটি বিপ্লবী আন্দোলনে পরিনত হয়েছে। এমনকি আধুনিক শিক্ষিত ও ছাত্র মহলে পর্যন্ত ইসলামী জাগরণের সাড়া পরে গেছে।

(গ) মুসলিমদেরকে বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় সুসংগঠিত করার জন্য মওলানা মওদুদী (রঃ) যে সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা এ যুগে অতুলনীয়। আধুনিক যুগে বাতিল পন্থীদের মযবুত সংগঠনের সাথে পাল্লা দিয়ে মুসলমানদেরকে একটা সুশৃঙ্খল শক্তিতে পরিনত করার জন্য তিনি যে সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্ম কৌশল দান করেছেন এর ফলে তার দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া সত্ত্বেও সংগঠন কোন দিক দিয়ে দুর্বল হবার আশংকা নেই।

জামায়াতে ইসলামী মওলানা মওদুদী (রঃ)- কে অতি মানব বা এমন কোন সত্তা মনে করে না যা অন্ধভক্তির সৃষ্টি করতে পারে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভক্তির বাড়াবাড়ি খতম করার জন্য সারা জীবন তিনি যে চেষ্টা করে গেছেন তার ফলে তার মধ্যে বহু দুঃস্বাপ্য গুণের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও মওলানাকে জামায়াত কোন প্রকার অতি ভক্তি মর্যাদা দেয়নি।

অবশ্য মওলানা মওদুদী (রঃ)- কে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও মুজাহিদ হিসেবে এবং আধুনিক জাহিলিয়াত বা ইসলাম বিরোধি মতবাদের বলষ্ট প্রতিরোধকারী ব্যক্তিত্ব বলে দুনিয়ার চিন্তাশীল মহল অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলাম মওলানার ব্যক্তিত্বকে মানুষের কাছে বড় করে তুলে ধরা ইসলামী আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন নি। মওলানা এ বিষয়ে এত সজাগ ছিলেন যে, মওলানার জন্ম দিবস পালন করতে তিনি অনুমতি দেননি। তার ইন্তেকালের পরও উপমহাদেশের কোথাও তার জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন করা হচ্ছে না। অথচ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় জামায়াতি ইসলামী প্রকাশ্য সংগঠন হিসেবেই আছে। কিন্তু কোথাও মওলানা মওদুদী (রঃ)- এর ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরা হচ্ছে না।

মওলানা মওদুদী (রঃ) আধুনিক যুগের সমস্যা ও মানব রচিত বিভিন্ন সমাধানের বিশ্লেষণ করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঐসব সমাধানের ত্রুটি স্পষ্টভাবে ধরিয়ে দিয়ে ইসলামের সমাধান যেরূপ যোগ্যতার সাথে পেশ করেছেন তাতে আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষিত লোকের পক্ষে ইসলামকে বুঝা সহজ হয়েছে। এজন্য মওলানা মওদুদী (রঃ)- এর রচিত ইসলামী সাহিত্য ছাড়া আধুনিক যুগে ইসলামী আন্দোলন করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তাই জামায়াতে ইসলামী তাঁর বই থেকে ফায়দা হাসিল করতে বাধ্য হচ্ছে। মওলানা মওদুদী (রঃ)- এর প্রচার যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবস অবশ্যই পালন করা হতো

মওলানা মওদুদী (রঃ) যাকে একমাত্র নেতা হিসেবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেনে চলার শিক্ষা দিয়ে গেছেন সেই বিশ্ব নবীই জামায়াতে ইসলামীর আসল নেতা। মওলানা মওদুদী (রঃ) যখন জামায়াতের আমীর ছিলেন তখন তাঁর প্রতি কখনও অতিভক্তি

দেখান হয়নি। তার প্রকৃত মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ পাকই দিতে পারেন। দুনিয়ায় তার মর্যাদা বাড়াবার কোন দায়িত্ব জামায়াত গ্রহন করেনি।

পাঁচঃ প্রায় সাত বছর আরব দুনিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশের বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে কেরামের সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। আমি তাদের সবাইকে মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর অত্যন্ত ভক্ত পেয়েছি। মাওলানা মওদুদী (রঃ)- কে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ বলেই সবাই স্বীকৃতি দিয়েছেন। পাক- ভারত- বাংলার বাইরে কোন ইসলামী ব্যক্তিত্বই মাওলানার লেখা সম্পর্কে কোন আপত্তি তুলেনি। অথচ মাওলানার সাহিত্য আরবী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যাপক অনুবাদ হয়েছে।

বিশ্বের বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ ও মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর সাহিত্যে ইসলামের একই ধরনের ব্যক্ষ্যা পড়ে আমার এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের দেশের যে কয়েকজন আলেম মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন তারা সম্ভবত মাওলানার সাহিত্য ভালভাবে পড়েননি।

অখন্ড ভারত বনাম পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে মাওলানা মওদুদীর বলীষ্ট ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারা বহু বড় বড় ওলামার রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধী ছিল। তাদের পক্ষ থেকেই এসব ফতোয়া প্রচারিত হয়েছে। সুতারাং রাজনৈতিক কারনেই ফতোয়া দেয়া হয়েছে বলে মনে হয়। এসব ফতোয়ার কোন মযবুত দ্বীনি ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

জামায়াত বিরোধী ফতোয়া

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যারা ফতোয়া দেন ও প্রচার করেন জামায়াত তাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট করে না। বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেন না, আধুনিক জাহিলিয়াতের সাথে যাদের কোন সংঘর্ষ নেই, যাদের ইকামাতে দ্বীনের কোন কর্মসূচী নেই, ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য যারা জামায়াতবদ্ধ ভাবে কিছু করে না তাদের পক্ষ থেকে এ জাতীয় যে সব ফতোয়া প্রচারিত হয় তা সচেতন মুসলমানদের নিকট কোন গুরুত্ব পায় না। ফতোয়া প্রচারক গনের প্রতি যে কজনের অন্ধ ভক্তি রয়েছে এ ফতোয়া দ্বারা ঐসব লোককে জামায়াত থেকে ফিরিয়ে রাখাই হয়ত তাদের উদ্দেশ্য।

জামায়াত তাদের দ্বীনি খেদমতকে স্বীকার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ পোষন করে না। ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রতিপক্ষ মনে করে না। জামায়াতের প্রতিপক্ষ হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও সংকিন্ৰ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। দেশে দ্বীনে হক ও দ্বীনে বাতিলের যে সংঘর্ষ চলছে তাতে অবশ্য ঐসব ফতোয়া বাতিলের পক্ষে লাগাচ্ছে। তবুও জামায়াত ফতোয়া নিয়ে বিচলিত নয় কারণ যারা ফতোয়া দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে জামায়াত কিছু করতেও চায় না, বলতেও চায় না। জামায়াত তাদেরকে বিরোধী শক্তি বলে মনে করে না। তাদের সাথে জামায়াতের কোন লড়াই নেই।

এসব ফতোয়ার বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, ফতোয়াদাতাগণ মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর- বই- এর কোন কোন কথা আপত্তিজনক মনে করেন এবং যেহেতু এ জামায়াতের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা সেহেতু ফতোয়াটা জামায়াতের বিরুদ্ধে ও দেয়া প্রয়োজন বোধ করেন। আগেই বলেছি যে মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর প্রতিটি কথা জামায়াতের বক্তব্য হিসেবে ধরা অযৌক্তিক। যদি ফতোয়া দিতেই হয় তাহলে তা লেখকের বিরুদ্ধেই দেয়া উচিত, জামায়াতের বিরুদ্ধে নয়।

মাওলানা মওদুদীর লিখিত বই- এর সব কথার সাথে সাবাই একমত হওয়া যরুরী নয়। সুতারাং ওলামায়ে কেরারদের মধ্যে যারা তার লেখায় ভুল দেখতে পান তারা এলমী দিক দিয়ে কুরআন হাদীসের যুক্তির ভিত্তিতে সমালোচনা করলে তাদের জ্ঞান থেকে জামায়াতের লোকেরাও উপকৃত হবে। ইজতিহাদি ভুলত সবারই হতে পারে। যোগ্য আলেমগন সেসব ভুল ধরিয়ে দিলে দ্বীনের বড় খেদমত হবে। অবশ্য এ কাজটি বেশ কঠিন কাজ। এ কাজটি না করে যদি ফতোয়া দেয়া সহজ মনে করা হয় তাহলে ফতোয়াদাতাগণের মর্যাদা এ দ্বারা বাড়ে না। হক ও বাতিলের লড়াই যেখানে সেখানে এ ফতোয়া বাতিলের সহায়ক হয়।

ফতোয়াদাতাগণ যদি ইকামাতে দ্বীনের মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীর চেয়ে উন্নত কোন দ্বীনি জামায়াত কায়ম করেন এবং আমাদের মতো কর্মীরা যদি মনে করেন যে আমরা ইসলামকে কায়ম করার যে নিয়তে জামায়াতে যোগ দান করেছি সে উদ্দেশ্যে তাদের কায়ম করা জামায়াতে গেলে আরও ভালভাবে সফল হবে, তাহলে এ জামায়াত ত্যাগ করে তাঁদের জামায়াতে যেতে একটুও দ্বিধা করবেন না। কিন্তু ইকামাতে দ্বীনের প্রোগ্রাম যাদের নেই তারা যখন যামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করেন, তখন তাদের সচেতন মু'তাকিদ, অনুসারী ও সারগিদদের নিকটও তাদের মর্যাদা নষ্ট হয়।

এসব ফতোয়া দেয়া যে ইসলামের কোন সত্যিকার খেদমত নয়, বরং এর দ্বারা যে ইসলামী আন্দোলনে বিরোধীদের তালিকায় তাদের নাম शामिल হচ্ছে সে কথা বুঝবার তৌফিক আল্লাপাক তাদেরকে দিন এ দেয়া করা ছাড়া তাঁদের মতো খাদেমে দ্বীনের সম্পর্কে আর কিছু বলার নেই। আদালতে আখেরাতেই চুরান্তভাবে দেখা যাবে যে, হকের পক্ষে কারা কাজ করেছে, আর বাতিলের সহায়ক কারা ছিল।

জামায়াতে ইসলামী ইকামাতে দ্বীনের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা সঠিকভাবে বিবেচনা করে দেখার জন্য ফতোয়াদাতাগনের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ পাক তাদেরকে যতটুকু যোগ্যতা দিয়েছেন তা নেতিবাচক কাজে খরচ না করে ইসলামের পক্ষে ইতিবাচক কাজে ব্যয় করার জন্য অনুরোধ করছি। আর যদি জামায়াতে ইসলামীকে সংশোধন করার নিয়তে যে কোন ধরনের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেন তাহলে জামায়াত তাদের এ মহান খেদমতের জন্য শুকরিয়া জানাবে। যারা দরদী মন নিয়ে এ জাতীয় সংশোধনের চেষ্টা করেন তারা ফতোয়ার ভাষায় কথা বলেন না।

মাওলানা মওদুদী (রঃ) বিবোধী ফতোয়া

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ) কুরআন পাকের তাফসীর ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)- এর জীবনী সহ ইসলাম সম্পর্কে ছোট বড় শতাধিক বই লিখেছেন। তার অগনিত পাঠক- পাঠিকা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে আছে। যিনি এতকিছু লিখেছেন তার লেখায় কোন ভুল ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। যারা জ্ঞান চর্চায় নিযুক্ত তারা যুক্তি- প্রমাণের ভিত্তিতে তার লেখার সমালোচনা করলে দ্বীনের অবশ্যই উপকার ও খেদমত হবে। এ বিষয়ে উপমহাদেশের কয়েকজনের লেখা পড়ে আমিও অনেক উপকৃত হয়েছি।

কিন্তু কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তার বিভিন্ন লেখা থেকে উদ্ধৃত নিয়ে এমন বিকৃত ব্যাঙ্গা করেছেন যে, কোন পাঠক মূল বই ও সমালোচকদের লেখা পড়লে স্বিকার করতে বাধ্য হবেন যে, লেখকের মূল বক্তব্যের সাথে সমালোচনার কোন মিল নেই। কতক সমালোচকদের ভাষা থেকে তাদের বিদ্রোহই প্রকাশ পায়।

যারা অন্ধবিরোধী ও বিদ্রোহী তারা সংশোধনের উপযোগী ভাষা ব্যবহার না করে ফতোয়ার হাতিয়ার ব্যবহার করেন --- এমনকি কারো কারো বক্তব্য হীন গালি গালাজের পর্যায়ে পড়ে। যারা সত্য তালাশ করেন তারা যদি মূল বই পড়ার চেষ্টা করেন তাহলেই শুধু বিচার করতে পারবেন। মূল বই যারা পড়েননি তারা কোন সমালোচকের লেখা পড়েই যদি সিদ্ধান্ত নেন তাহলে অবশ্যই তার প্রতি অবিচার করা হবে। আসামীর জবানবন্দি না নিয়ে শুধু ফরিয়াদির নালিশ শুনেই যে বিচারক রায় দিয়ে বসে তাকে কখন ন্যয় বিচারক বলা চলে না।

মাওলানা মওদুদী লিখেছেন বলেই কোন কথা সঠিক বলে আমি গ্রহন করি না। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল সহকারে যেসব কথা তিনি পেশ করেছেন তা আমার বিবেক বুদ্ধি দ্বারা যাচাই করেই গ্রহন করি। তাই যারা দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে তাঁর সমালোচনা করেন তাদের কথা গ্রহন করতে আমি দ্বিধা করি না। কারণ মাওলানা মওদুদী (রঃ)- কে আমি নির্ভুল মনে করি না। কিন্তু যারা ফতোয়ার ভাষায় কথা বলেন, তারা মাওলানার ভুল সংশোধনের চেয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য বলে তাদের কথা আমি বিবেচনা যোগ্যই মনে করি না।

মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর “খেলাফাত ও মুলুকিয়াত” নামক বই সম্পর্কে বাংলাদেশের কয়েকজন আলেম জোরদার আপত্তি তুলেছেন। এর মধ্যে হযরত মাওলানা শমসুল হক ফরিদপুরী (রঃ)- এর লেখা “ভুল সংশোধন” নামক পুস্তিকাটিকে অবশ্যই আমি পড়ার যোগ্য বলে আমি মনে করি। মাওলানা ফরিদপুরী (রঃ) মাওলানা মওদুদী (রঃ)- কে অত্যন্ত মহব্বত করতেন এবং আমাকেও খুব স্নেহ করতেন। তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার দরুন আমি জানতাম যে “ খেলাফত ও মুলুকিয়াত” সম্পর্কে তার যথেষ্ট আপত্তি আছে। তিনি মাওলানা মওদুদী (রঃ) এর নিয়তের উপর হামলা করতেন না। এবং তাকে সাহায্যে কেরামের বিরোধী বলেও মনে করতেন না। “খেলাফত ও মুলুকিয়াত” লিখতে গিয়ে মাওলানা মওদুদী (রঃ) যেসব ঐতিহাসিকের হাওয়লা দিয়েছেন তাদের কয়েক জনকে মাওলানা ফরিদপুরী শিয়া বলে মনে করতেন এবং শিয়া ঐতিহাসিকের মতামত গ্রহন করার ফলেই লেখক ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

মাওলানা ফরিদপুরী (রঃ) “খেলাফাত ও মুলুকিয়াত” বইটির সমালোচনায় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে বুঝা যায় যে, তার অন্তরে বিদ্রোহ নেই এবং পূর্ণ ইখলাসের ভিত্তিতে তিনি লিখেছেন। একথা “ভুল সংশোধন “ নামকরন থেকে স্পষ্ট। তিনি জনগনকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে লেখেননি। মাওলানা মওদুদীর লেখায় যেখানে তিনি ভুল মনে করেছেন সেখানেই সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য বইটির কোথাও কোথাও এমন কিছু কথা আছে যা মাওলানা ফরিদপুরী (রঃ)- এর স্বভাবসুলব শালীন ভাষার

সাথে মিল খায় না।সেসব কথা অন্যের সংযোজন কিনা তা আল্লাহ পাকই জানেন।বইটির প্রকাশক শুরুতেই কয়েকজন আলেমের অত্যন্ত অশালীন বক্তব্য যোগ করে দিয়েছেন।তাতে সন্দেহ হয় যে , বইটির সকল বক্তব্য মাওলানা ফরিদপুরীর নয়।

যারা সুবিচারক ও সত্য তালশ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অনুরোধ করছি তারা যেন , “খেলাফত ও মুলুকিয়াত” বইখানার সাথে মাওলানা ফরিদপুরী (রঃ)- এর লেখা “ভুল সংশোধন” মিলিয়ে পড়ে দেখেন।যে সব আন্দোলন “ভুল সংশোধনে” তোলা হয়েছে এর জবাবও মূল বই- এর শেষ ভাগে দেয়া হয়েছে।বইটি পড়ে যেখানে যেখানে মাওলানা মওদুদী (রঃ) ভুল করেছে বলে পাঠকের ধারণা হয় সেসব কথা না গ্রহন করলেই হলো। কোন লেখকের সব কথাই সঠিক হওয়া যাবুঝী নয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, “খেলাফত ও মুলুকিয়াত” বইতে হযরত মুয়াবিয়া (রঃ) সম্পর্কে যেসব কথা আলোচনা হয়েছে তাকে ভিত্তি করে কোন কোন সমালোচক মাওলানা ফরিদপুরী (রঃ)- কে সাহাবায়ে কেরামের নিন্দাকারী ও অপমানকারী বলে প্রমান করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের লেখার বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা থেকে মনে হয় যে, মাওলানা ফরিদপুরী (রঃ)যেন সাহাবাদের প্রতি ঘৃনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বইটি লিখেছেন অথচ তাফহিমুল কুরআন নামক মাওলানার তাফসীর ও অন্যান্য বইতে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত আল জামায়াতের আকিদা মোতাবেক সেসব উচ্ছসিত ও আবেগপূর্ণ প্রশংসা করা হয়েছে সে সব কথা তারা পড়েছে কিনা জানি না।“খেলাফত ও মুলুকিয়াত” বইটিতে যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা ইসলামের ইতিহাসের এমন কতক দুঃখজনক কতক ঘটনার সাথে জড়িত যে, যারাই এ বিষয়ে কলম ধরবে তাদের পক্ষে একই সাথে হযরত আলী (রঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রঃ)কে সঠিক নীতির উপর কেমন ছিলেন বলে প্রমান করা অসম্ভব। আহলে সুন্নাত আল জামায়াতের আকিদা অনুযায়ী হযরত আলী (রঃ)খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত।হযরত মুয়াবিয়া (রঃ) হযরত আলী (রঃ)- এর খেলাফতকে মেনে নেননি।এ অবস্থায় উভয়ই কি করে একই মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন?

মাওলানা ফরিদপুরী (রঃ) হযরত মুয়াবিয়াকে (রঃ) হযরত আলী (রাঃ) চেয়েও অনেক যোগ্য খলিফা হিসেবে প্রমান করার চেষ্টা করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া (রঃ)- এর বিরুদ্ধে যত অভিযোগ রয়েছে সবই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন।এ সত্ত্বেও উম্মাতে মুসলিমা হযরত মুয়াবিয়া (রঃ)- কে কেন খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন না তা এক বিরাট প্রশ্ন।

হযরত মুয়াবিয়া (রঃ)সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও আহলে সুন্নাত আল জামায়াতে তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না।তাঁকে খলীফা না বলে আমীর মুয়াবিয়া (রঃ)বলা হয়।এর নিশ্চই কোন কারন রয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া (রঃ)ইসলামের বিরাট খেদমত করেছেন বলে স্বীকার করেও ইসলামী খেলাফতের নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে ঐতিহাসিকগণ তাঁর নীতিকে সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন।যারাই হযরত মুয়াবিয়া (রঃ)- এর পক্ষে যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করেছেন তারা খোলাফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রঃ)- কে দোষী সাব্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন।সুতরাং এ ইতিহাস এমন সমস্যাপূর্ণ যে, এ দু’জনকে একই মর্যাদার অধিকারী মনে করা এক প্রকার অসম্ভব।

তাই ইতিহাসের অনিবার্য প্রয়োজনে যারা এ বিষয়ে আলোচনা করেন তাদের কথা নিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় চর্চা করা উচিত নয়।যারা ঐতিহাসিক নয় তারা এ নিয়ে বিতর্ক করতে গেলে ফেতনা সৃষ্টি হবার আশঙ্কা রয়েছে।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি আলোচনা করতে গিয়ে মাওলানা মওদুদী (রঃ)কুরআন- সুন্নাহ ও ইজমা- কে আইনের উৎস বলে উল্লেখ করেছেন।ইজমা মানে সর্বসম্মত রায়।উম্মাতে মুহাম্মাদীর ওলামায়ে কেরাম কোন বিষয়ে একমত হলে সেটাকেই যিনি শরীয়াতের হুজ্জাত বা দলিল বলে স্বীকার করেন তিনিই যে সাহাবায়ে কেরামের ইজমাকে আরও উচ্চমানের মুজ্জাত মনে করেন তাতে সন্দেহ করার কোন যুক্তি নেই।

১৯৫০ সালে আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী (রঃ)- এর সভাপতিত্বে করাচীতে অনুষ্ঠিত সর্ব শ্রেণীর ৩১ জন বড় বড় আলেমের যে সম্মেলন ইসলামী শাসন তন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি ঘোষণা করা হয় সেখানে মাওলানা মওদুদী (রঃ) যোগ্য ভূমিকা পালন করে ছিলেন।তদানিন্তন পাকিস্তানের ৩১ জন শ্রেষ্ঠ মাওলানার মধ্যে মাওলানা মওদুদী (রঃ)বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যারা ফতোয়া দেন তারা নিজেদের মর্যাদাই নষ্ট করেন।যুক্তির মাধ্যমে মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর বক্তব্য খন্ডন করা অবশ্যই দ্বিনী দায়িত্ব।কিন্তু ফতোয়া প্রচার করা দ্বারা দ্বিনের কোন উপকার হচ্ছে কিনা তা বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করছি।

আরও একটা কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে হয়। মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর বিরুদ্ধে পাক- ভারত ও বাংলাদেশের কয়েকজন আলেম অবশ্যই বিরূপ মন্তব্য করেছেন।কিন্তু দুনিয়ার বড় বড় ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মওদুদী (রঃ)- কে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও ইসলামের মহান বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকার করেন।তাঁর লেখা তাফসীর ও অন্যান্য বই দুনিয়ার ৪০টি ভাষায় তরজমা হয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট ইসলামের আলো পৌঁছাচ্ছে। সুতরাং এ দেশের কিছু

সংখ্যক লোক ফতোয়া দিয়ে বা আলোকে চাপা দিয়ে রাখতে পারবেন না। আমার বিশ্বাস যে তারা যদি মওলানা মওদুদী (রঃ)-এর বইপত্র মন দিয়ে পড়তেন তাহলে পছন্দই করতেন।

ওলামা ও মাশায়েখে কেবামের খেদমত

ওলামায়ে কেবামে ও মাশায়েখে এযামের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। কারন তাঁরাই হলেন নবীর ওয়ারিস। তাঁদের কাছে কুরআন ও সুন্নার ইলম পাওয়া যায়। অশিক্ষিত লোকদের তো তাঁদের খেদমতে যাওয়া ছাড়া দ্বীনি ইলম ও আমল শেখার কোন পথই নেই। আধুনিক শিক্ষিতদেরও ইসলামের সিঠিক জ্ঞান পেতে হলে এবং রাসূলের অনুসরণ করতে হলে ওলামায়ে কেবামে ও মাশায়েখের সাহায্য নেয়া ছড়া উপায় নেই। দ্বীনের ব্যপাক জ্ঞান কুরআন ও হাদীস থেকেই পেতে হয় এবং এ বিষয়ে যারা জ্ঞানী তাঁদের সহায়তা ছাড়া যে ইংরেজী শিক্ষিত এবং কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীদের কোন উপায় নেই এর সক্ষী আমি নিজে।

কুরআন, হাদীস ও ফেকাহ থেকে গভীর ইলম হাসিল করার জন্য কোন কাওমী বা আলীয়া মাদ্রাসায় পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যেটুকু সামান্য জ্ঞান আল্লাহ পাক আমাকে দান করেছেন তা হাক্কানী ওলামায়ে ও মাশায়েখের মারফতেই পেয়েছি। আলেম পিতার বিশেষ তাগিদে বি, এ, পর্যন্ত অন্যতম বিষয় হিসেবে আরবী পড়তে বাধ্য হওয়ায় যেটুকু আরবী ভাষা আয়ত্ব হয়েছিল সেটুকু সম্বল করেই ইসলাম সম্পর্কে পড়াশনার কিছু চেষ্টা করেছি। স্কুল জীবন থেকেই বাংলা ভাষায় হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রঃ)-এর অনুদিত বই পড়ার সুযোগ হয়। ১৯৩৮ সালে আমি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকেই “নেয়ামত” নামক মাসিক পত্রিকার নিয়মিত পাঠক হিসেবে হযরত খানভী (রঃ)-এর যুক্তিপূর্ণ ওয়ায দ্বারা আমি গভীরভাবে আকৃষ্ট হই। তাই হযরত খানভী (রঃ)-এর লেখার অনুবাদক হিসেবেই হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ)-এর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়।

১৯৫০ সালে এম, এ পরীক্ষার কয়েক মাস আগে তাবলীগ জামায়াতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পরীক্ষার পর তিন চিল্লায় বের হই। এ দেশে তাবলীগ জামায়াতের আমীর হযরত মাওলানা আব্দুল আযীযের সাথে চিল্লা দেবার সুযোগ পাওয়ায় এবং তাবলীগের চিল্লা উপলক্ষে হিন্দুস্তান গিয়ে অনেক যোগ্য আলেমের সোহবতে দ্বীনের পথে জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা পাই। সাড়ে চার বছর তাবলীগ জামায়াতে নিয়মিত কাজ করার যে তৌফিক আল্লাহ পাক দিয়েছেন তাতে আমার জীবনে এ জযবা পয়দা হয়েছে যে, দ্বীন ইসলামই মুসলিম জীবনের একমাত্র মিশন বা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

১৯৫২ সালে তমদ্বুন মজলিসের মাথে সম্পর্ক হওয়ার ফলে ইসলামকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে বুঝবার সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবন যে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক জীবনেও রাসূল যে বিপ্লব সাধন করেছেন সেদিক থেকেও ইসলাম সম্পর্কে তখন পড়াশুনা শুরু করি। তমদ্বুন মজলিসের মারফতেই সর্বপ্রথম আমি মাওলানা মওদুদী (রঃ)-এর কিছু বই বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় পড়ার সুযোগ পাই।

এরপর দু’বছর পর্যন্ত আমি একাগ্র চিত্তে তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্বুন মজলিসে কাজ করতে থাকি। একই সাথে এ দুটো সংগঠনের সাথে কাজ করে দুদিকের বই পুস্তক ভালভাবে পড়ার সুযোগ পাই। আমি তখন অনুভব করি যে, ইসলামের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দিকের জন্য তাবলীগ জামায়াতে থাকা আমার জন্য অপরিহার্য এবং ইসলামে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও অন্যান্য দিকের জন্য তমদ্বুন মজলিস ত্যাগ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। একটি পূর্ণঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে মনে প্রানে গ্রহণ করার পর শুধু তাবলীগ জামায়াত বা তমদ্বুন মজলিসে আমার তৃষিত মনের খোরাক পেতাম না। তাই এ দুটোর সমন্বয়ে পূর্ণঙ্গ ইসলাম পাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

সেকালে লালবাগ শাহী মসজিদে তাবলীগ জামায়াতের মাসিক বড় ইজতিমা হতো। তাতে আমাকেও বক্তৃতা দিতে হতো। তাবলীগের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছয় উসূলের যে বক্তৃতা আমি করতাম তা শুনে হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ) তার নিকটবর্তী লোকদের কাছে আমার সম্পর্কে মন্তব্য করতেন, “এ লোক তাবলীগ জামায়াতের কর্মসূচী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না” পরবর্তীকালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পর তার সাথে দেখা করতে গেলে সেখানে উপস্থিত অনেককে সাক্ষি রেখে বললেন, “আমি বলেছিলাম না যে, তাবলীগ জামায়াত একে আটকিয়ে রাখতে পারবে না?” তাঁর কথা শুনে আমি অনুভব করলাম যে, তাবলীগ জামায়াতের মঞ্চে বক্তৃতা কালেও তমদ্বুন মজলিসের ইসলামী বিপ্লবের সুর আমার কথায় হযত প্রকাশ পেতো। তাই তার মতো জ্ঞানী ব্যক্তি এ কথা আচ করতে পেরেছিলেন। জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দান করার ফলে তিনি আমাকে উৎসাহিত করায় আমি আরও নিশ্চিত হলাম।

১৯৬৮ সালে ইংরেজী ভাষায় আমার লেখা A Guide to Islamic Movement (ইসলামী আন্দোলনের দিশারী) নামক বই-এর ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম, “আমার পিতা থেকে ইসলামকে একটি ধর্ম বলেই বুঝেছিলাম। হযরত

মাওলানা থানভী (রঃ)- লেখা ও মাওলানা ফরিদপুরী (রঃ)- এর সোহবতে বুঝতে পারলাম যে, ইসলাম এক মহান মিশন এবং এর জন্য জীবন উৎসর্গ করাই ঈমানের দাবী। জামায়াতে ইসলামীতে এসে অনুধাবন করলাম যে, ইসলাম এমন এক বিপ্লবী আন্দোলন যার মাধ্যমে আল্লার জমীনে আল্লার বিধানকে কায়েম করার জন্য চেষ্টা করা মুমিনের জীবনে সবচেয়ে বড় ফরয। এখন আমি কৃজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি যে, হযরত থানভী, তাবলীগ জামায়াত, তমদ্দুন মজলীস ও জামায়াতে ইসলামী আমাকে ক্রমিক পর্যায়ে সত্যিকার মুসলিম হবার প্রেরনা যুগিয়েছে। জামায়াতে ইসলামীতে এসে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের রূপ বিস্তারিতভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছি।

জামায়াতে ইসলামীর বাইরে এমন কয়েকজন বড় আলেমের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল যাদের কাছ থেকে দ্বীনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমি যথেষ্ট আলো পেয়েছি। তাঁরা যেহেতু আমাকে স্নেহ করতেন সেহেতু অল্প সময়েও অনেক বেশি ফায়দা তাদের কাছ থেকে হাসিল করার সুযোগ তারা দিতেন। হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ)- এর মাধ্যমে হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রঃ)- এর মতো মহাজ্ঞানীর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সকল প্রকার দ্বীনি খেদমত ও সব দ্বীনি সংগঠনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সবার সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করার ব্যপারে এ দু'জনের মতো এমন বিশালমনা লোক বাংলাদেশে আমি পাইনি। এ দু'জনের সাথে যত বেশি সময় ঘনিষ্ঠভাবে মিশার সুযোগ পেয়েছি অন্যদের সাথে এতটা না পেলেও অন্যদের সম্পর্কে বহু মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছি। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ

হযরত	মাওলানা	সাইয়েদ	মাহমুদ	মুস্তফা	আল	মাদানী	শহীদ	(রঃ)
হযরত	মাওলানা		মুহাম্মদ		আকরাম	খান		(রঃ)
হযরত	মাওলানা	আব্দুল্লাহিল	কাফী		আল	কুরাইশী		(রঃ)
হযরত		মাওলানা	আতাহার			আলী		(রঃ)
হযরত	মাওলানা	মুফতী	দ্বীনি		মুহাম্মাদ	খান		(রঃ)
হযরত	মাওলানা	মুফতী	সাইয়েদ	আমীমুল	ইহসান			(রঃ)

জামায়াতকে ইসলামীর অন্তর্ভুক্ত পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, ও বাংলাদেশের বহু ওলামার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁদের এবং জামায়াতের বাইরে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদেদের বই- পুস্তককে আমার দ্বীনি যিন্দেগীর পাথেও হিসেবে পেয়েছি।

এ আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রকাশ করতে চাই যে, আমাদের মতো অগনিত আধুনিক শিক্ষিত লোকের পক্ষে ইসলামের ইলম ও আমল সম্বন্ধে শিক্ষা পেতে হলে ওলামা ও মাশায়েখের সাহায্য ছড়া উপায় নেই। আল্লার ফজলে আজ স্কুল , কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে মাওলানা মওদুদী (রঃ) ও অন্যান্য ওলামায়ে কেলামের বই পুস্তকের ছাত্র সমাজ পর্যন্ত ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। সে শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা ইসলামী ইলম ও আমলের বিপারীত মন- মগজ চরিত্রের লোক তৈরী হচ্ছে সেখানে যেসব ইসলামী সাহিত্য এমন উৎসাহজনক জাগরন সৃষ্টি করেছে সেসব সাহিত্য ওলামাদেরই রচিত।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র ও অছাত্র কর্মীরা ইসলামী জীবন বিধানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এবং কুরআন পাককে রাসুলের ইসলামী আন্দোলনের আলোকে বুঝবার জন্য যেসব বই পুস্তকের সাহায্য নিচ্ছে এর বেশির ভাগই মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর লেখা। কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে রচিত অতীত ও বর্তমানের অন্য ওলামাদের যেসব বই বাংলায় পাওয়া যায় তা থেকেও তারা যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছে। কিন্তু মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর এ লেখা বাদ দিয়ে চলার কোন উপায় নেই বলে বাধ্য হয়ে তাঁর লেখা বই সবাই পড়ছে। যদি আর কারো ইসলামী সাহিত্য প্রচুর থাকত এবং তাদের সাহিত্য যদি ইসলাম বিরোধী মত ও পথের বিরুদ্ধে মযবুত কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারতো তাহলে আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষিত অনেকেই মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর সাহিত্য ছাড়াই এ পথে এগুতে পারতো।

ওলামা ও মাশায়েখে কেলাম কি এমন আর কোন ব্যক্তির নাম পেশ করতে পারবেন যার সাহিত্য আমাদেরকে ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে এ যুগের উপযোগী ভাষার বিস্তারিত শিক্ষা দিতে পারে? এ পরিস্থিতিতে যখন কোন আলেম মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন তখন তাঁর সম্পর্কে ইসলামী আন্দোলনের শিক্ষিত কর্মীদের কিরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে? কোন দ্বীনি ব্যক্তি যখন বলেন যে, “আমি মওদুদীর ইসলাম পছন্দ করি না” তখন কর্মীদের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, মওদুদী (রঃ) ইসলামকে যতটুকু বুঝবার চেষ্টা করেছেন তা তো তার লেখা সাহিত্যে স্পষ্টই দেখা যায়। তিন্তু যিনি এ কথা বলেন তিনি ইসলামের কোন ভাল ব্যক্ষা দিয়েছেন কিনা সে কথা তো কারো জানবার সুযোগ হলো না। তাহলে ঐ ব্যক্তির এ জাতীয় ঘোষণা দ্বারা ময়দানের হাজার হাজার কর্মীর মনে কি তাঁর সম্পর্কে কোন সুধারনার সৃষ্টি হতে পারে? যদি তিনি সঠিক ইসলাম পেশ করে নিজেকে “মওদুদীর ভুল ইসলাম” থেকে রক্ষা করার যোগ্য বলে প্রমাণ দিতে পারতেন তাহলে ইসলামের

জন্য যারা বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তাঁরা তাকেই নেতা হিসেবে গ্রহন করতো এবং মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর বই পড়া দরকার মনে করতো না।

আমি সকল হাক্কানী ওলামা ও মাশায়েখের খেদমতে অতি বিনয়ের সাথে আরজ করছি যে, আপনারা মেহেরবানী করে একটু সময় ও শ্রম খরচ করে মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর ৬ খন্ডে লিখিত তাফসীর “তাহফীমুল কুরআন” এবং এ যুগের মানুষের অগণিত প্রশ্নের ৭ খন্ডে জওয়াব “রাসায়েল ও মাসায়েল” নামক পুস্তকগুলো পড়ে দেখুন। শুধু অন্যের মন্তব্য শুনেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে নিজে দেখে ফয়সালা করুন। এটা বিরাট জিম্মাদারীর কাজ। আল্লার কাছে আমাদের সবারই জবাবদিহি করতে হবে।

আজ বাংলাদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে কত বড় বড় ফিতনা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে! ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিরাট শক্তি নিয়ে এ দেশ থেকে ইসলামী আদর্শকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বাস্তব ময়দানে এসব ফিতনা মোকাবিলায় কারা কতটুকু ইসলামের পক্ষে কাজ করছে তা দেশবাসী সবাই দেখতে পাচ্ছে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো কাদেরকে প্রকৃত দুশমন মনে করছে তা সবাই দেখছেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ ময়দানে যারা ইসলামী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করছে এবং যাদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা একজোট হয়ে লেগেছে তারা কি আপনাদের সবার সাহায্য- সহানুভূতি ও সমর্থনের কোন হুক রাখে না?

এ অবস্থায় ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন না করে যারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে “মওদুদী ফিতনা” বলে ফতোয়া দেন তাদের এ কাজ কি পরোক্ষভাবে ইসলামের দুশমনদের পক্ষে যায় না? ইসলামের প্রতি সত্যিকার দরদ থাকলে ময়দানে কর্মরত ইসলামী কর্মীদেরকে সাহায্য করাই স্বাভাবিক। মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর বই- এর যে সব কথা কুরআন হাদীস সম্মত নয় বলে কেউ মনে করেন যুক্তি সহকারে সেসব ভুল ধরিয়ে দিন। এভাবে ভুল ধরিয়ে দিলে ইসলামের বিরাট খেদমত হবে এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা এ ধরনের ওলামা মাশায়েখের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু এ কষ্টটুকু স্বীকার না করে যদি ফতোয়া দিয়েই দায়ীত্ব পালনের চেষ্টা করা হয় তাহলে ফতোয়াদাতা গন সচেতন লোকদের কাছে শ্রদ্ধার আসন কি করে পাবেন।

ওলামা ও মাশায়েখ সাহাবানের খেদমতে একটা বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা ও বিবেচনা করার জন্য আমি আকুল আবেদন জানাচ্ছি। আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, ভারতপন্থি ও সমাজতন্ত্রী দলগুলো কিভাবে বৈদেশীক পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতার দখলের চেষ্টা করছে তা নিশ্চই আপনারা লক্ষ্য করেছেন। ছাত্র সমাজের মধ্যেও এসব দলের বহু সংগঠন আছে। এসব ইসলাম বিরোধী শক্তির মুকাবিলায় বৃহত্তর ময়দানে জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্র মহলে ইসলামী ছাত্র শিবির যে সংগ্রাম করে যাচ্ছে তাও আপনাদের অজানা নয়। এ অবস্থায় যারা ইসলামকে ভালবাসেন তাদের কি কর্তব্য হওয়া উচিত তা আপনারাই বিবেচনা করুন। এ পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামীকে সাহায্য সহযোগিতা দান করাই কি দ্বীনি দায়িত্ব নয়? এ দায়ীত্ব পালন না করার ফলে যদি ইসলাম বিরোধী শক্তি বিজয়ী হয়ে যায় তাহলে আপনাদের বর্তমান দ্বীনি খেদমতটুকুর সুযোগ থাকবে কিনা তা চিন্তা করার এখনও সময় আছে।

সর্বশেষ আরয করতে চাই যে, মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর লেখা বই- এর মধ্যে আহলি সিন্নাত ওয়াল জামাতের খেলাফ যদি কোন কথা থাকে তাহলে সেসব চিহ্নিত করার ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমরা নিজেদেরকে আহলী সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিশ্বাস করি। তাই এ দিক দিয়ে তার বই- এর মধ্যে ভুল থাকলে তা আমরা কোনক্রমেই গ্রহন করবো না। এ বিষয়েও একটি কথার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেউ কেউ মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর কোন কথা মূল বই- এর বক্তব্য থেকে আলাদা করে (সিয়াক ও সাবাক ছাড়া) এমন ভাবে পেশ করে থাকেন যার ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই মূল বই না দেখে শুধু বিচ্ছিন্ন কোন কথার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌছা নিরাপদ নয়।

অগণিত আধুনিক শিক্ষিত লোকের সাথে আমার ব্যাপক যোগাযোগ হয়। তাদের অধিকাংশই আলেম সমাজ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে না। তাদের সাথে আমার বিতর্ক হয় তাদেরকে আমি বুঝাই যে দ্বীনের ইলম আলেম সমাজ থেকেই পেতে হবে। তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে দ্বীনের ইলম কোথা থেকে পাওয়া যাবে? আলেম সমাজকে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে গন্য হতে হলে ফতোয়ার ভাষায় মাওলানা মওদুদী (রঃ)- এর সমালোচনা না করে সংশোধনের নিয়তে ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। যেসব শিক্ষিত লোক ইসলাম সম্পর্কে জানতে উৎসাহী তারা মাওলানা মওদুদীর বইকেই প্রধান সম্বল হিসেবে পান। ফতোয়ার কারণে যদি এসব লোকের মনে ওলামা ও মাশায়েখ সম্পর্কে অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয় তাহলে দ্বীনের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু দরদপূর্ণ ভাষায় যদি তার ভুল ধরিয়ে দেন তাহলে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যাবে।

সমাগু